দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক
— পৃঃ ২৩

যাদবপুরের একটি র‍্যাগিং মৃত্যু এবং একাধিক জিজ্ঞাসা
— পৃঃ ১১

৭৫ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা।। ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।। ১৭ ভাদ্র - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা, ১৭ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৪ সেপ্টেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

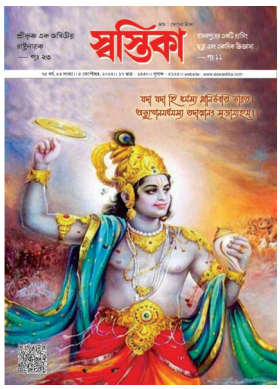

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুড়ো পচেছে অনেক আগেই 'অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু...' □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দুর্গা মা আসছেন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আরাধনা হবে □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ধ্যানধারণা পরিবর্তনের সময় এসেছে □ আর জগন্নাথন □ ৮

বিশ্বের প্রতিটি মানুষ আদিতে হিন্দু ছিলেন □ বরুণ মণ্ডল □ ১০

যাদবপুরের একটি র‍্যাগিং মৃত্যু এবং একাধিক জিজ্ঞাসা □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১১

কর্মযোগী হও— এটাই শ্রীকৃষ্ণের বাণী □ রবিব্রত ঘোষ □ ১৪

শিক্ষা পদ্ধতিতে ড. রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের প্রয়োগের মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে শিক্ষক দিবস □ পিন্টু সান্যাল □ ১৬

শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক □ ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় □ ২৩

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা : ব্রহ্মার কৃষ্ণলীলা দর্শন □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩১

নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে □ প্রদীপ মারিক □ ৩৩

বৈষ্ণবধর্ম হলো হলো শক্তির উপাসনা, অহিংসার সাধনা নয় □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ৩৫

পাশ্চাত্যের মাটিতে পুনরুচ্চারিত হলো হিন্দুত্বের জয়ঘোষ □ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় □ ৩৮

কয়েক ডজন নারীর অবমাননা ও হত্যাকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর উত্থান হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়েছিল □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ৪৩

ভারত বিরোধী বাম-কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক অন্তর্জাল রচনা □ স্বরূপ কুমার ধবল □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৮-২৯ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮

প্রকাশিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

চন্দ্রযানের সফল অবতরণ

যে কোনো সাফল্যের পিছনে থাকে মেধা ও পরিশ্রম। ইসরোর বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে চন্দ্রযানের সফল উৎক্ষেপণ ও মসৃণ অবতরণ সারা পৃথিবী চাক্ষুষ করেছে। এটা ভারতের কত বড়ো সাফল্য তা বলার মতো নয়, বিশ্বকে বিস্ময়ে ফেলে ভারত প্রমাণ করেছে 'আমরাও পারি'। বলা যেতে পারে, ভারত এক নতুন গ্যালাক্সিতে পদার্পণ করল।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে চন্দ্রযানের সাফল্যের বিবরণ। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সম্পাদকীয়

ধর্মরাজ্য সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ

জ্ঞানীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভক্তগণ তাঁহাকে অবতারপুরুষ মনে করিয়া তাঁহার উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া, তাঁহাকেই সর্বকর্মের নিয়ন্তা মনে করিয়া কর্তব্যকর্মে বিমুখ থাকিয়াছেন। সাধারণ মানুষ তাঁহার লীলাকীর্তনে নয়নজলে বুক ভাসাইয়া ভবসাগর পার হইবার পথ খুঁজিয়াছেন। তাহার ফলে কর্মবীর, নীতিনিষ্ঠ, ধর্মরাজ্য সংস্থাপক, দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালনকারী এই মহান পুরুষের স্বরূপটি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যাঁহার সমগ্র জীবন ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সংঘর্ষময়, তাঁহাকে অহিংসার প্রতিমূর্তি সাজাইয়া সমাজকে ক্লীবত্বে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্লীবত্বে আচ্ছন্ন অর্জুনকে তিনি ধর্মযুদ্ধের নিমিত্ত উদ্দীপিত করিতে বলিয়াছিলেন, ক্লৈবং মাস্ম গম পার্থ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে অর্জুনকে উদ্দীপিত করিতে তিনি মনুষ্যসমাজকে গীতাগ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানসন্ন্যাসযোগ, কর্মসন্ন্যাসযোগ, আত্মসংযমযোগ প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের কর্মসম্পর্কিত অষ্টাদশটি বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। গীতার উপদেশে উদ্দীপিত অর্জুনকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি দুষ্টের সংহার করিয়া ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। গীতাগ্রন্থটি বিশ্ববাসীর নিকট মহাগ্রন্থ হিসাবে মান্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে গীতাকে ভারতের জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে ঘোষণা করিবার দাবিও উঠিয়াছে। বাঙ্গালি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের প্রকৃত দিক বাঙ্গালির নিকট উন্মোচন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কাহিনির বিকৃত দিকগুলিকে তিনি 'পাপোপাখ্যান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন বিকৃতিগুলি কোনো-না-ভাবে কৃষ্ণচরিত্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণচরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপ সংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোনো দেশীয় ইতিহাসে নয়, কোনো কাব্যেও নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রজ্ঞা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্যই ভারতবর্ষে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বীরত্ব, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে ভুলিয়াছিল বলিয়াই ভারতবাসীকে দীর্ঘ পরাধীনতার ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙ্গালিকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের তিথিটি জন্মাষ্টমী নামে অভিহিত। বঙ্গীয় সমাজে তো বটেই, সমগ্র ভারতবর্ষ, এমনকী বিশ্বের বহু দেশে দিনটিতে সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশসমুহের মানুষও শ্রীকৃষ্ণকেই তাহাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ ইসকন সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণকেন্দ্রিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টায় রত রহিয়াছে। মানুষ এইদিন উৎসবে মাতিয়া তাঁহার কর্মময় জীবনের স্মরণ মনন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি সমাজ কিন্তু অদ্যাবধি উৎসবটি তথাকথিত লীলাকীর্তনেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। উৎসবটি শুধুমাত্র রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাতেই সীমিত না রাখিয়া তাঁহার ক্ষাত্রতেজের কীর্তনে পরিপূর্ণ করিতে হইবে। দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টের পালনকারী, ধর্মরাজ্য সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থাপন করিতে হইবে। উপস্থাপন করিতে হইবে কীভাবে তিনি তাঁহার কর্ম ও বুদ্ধিমত্তায় দেবত্বে উন্নীত হইয়া একজন রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জন্মাষ্টমী উৎসব হইল হিন্দুদিগের ক্লীবতা হইতে উত্তরণের দিন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানকে মসজিদে রূপান্তরিত দেখিয়াও বাঙ্গালি হিন্দু মর্মে পীড়া অনুভব করেন না। বাঙ্গালির আবাসভূমি নৈরাজ্যে পরিণত হইয়াছে তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। জন্মাষ্টমী উৎসব নৈরাজ্যের অবসান করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্প গ্রহণের দিন। ইহা শুভ সংকল্প। এই প্রকার সংকল্পে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সহায়তা করিয়া থাকেন। তিনি নিজেই অঙ্গীকারবদ্ধ রহিয়াছেন– সম্ভবামি যুগে যুগে। উল্লেখ্য, এই প্রকার শুভ সংকল্প লইয়াই পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে জন্মাষ্টমীর শুভ দিনটিতেই স্বস্তিকা পত্রিকা তাহার যাত্রা শুরু করিয়াছে। জয়তু শ্রীকৃষ্ণ।

সুভাষিতম্

পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেব নাভ্যঃ স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ।
নাদন্তি সস্যং খলু বারিবাহাঃ পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ।।

নদীসমূহ নিজের জল পান করে না, বৃক্ষ সকল নিজের ফল ভক্ষণ করে না, মেঘ নিজের দ্বারা সিঞ্চিত শস্য গ্রহণ করে না। সৎ পুরুষরাও নিজের জন্য নন, পরোপকারের জন্যই রত থাকেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুড়ো পচেছে অনেক আগেই

‘অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু...’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

এ লেখা কোনো কেতাদুরস্ত প্রতিবেদন নয়। এ লেখা মানুষের দলিল। দেশের দলিল। বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তিন নম্বর কিস্তি লিখছি। শহরের কোনো খবরের কাগজ এ কাজটি করবে না। ওখানে এখন ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে বেশ কিছু দেশ-বিরোধী আর জিহাদি। যাদের সরাতেই হবে। এরা ভারতের সংস্কৃতি, সভ্যতা মানমর্যাদার বিরোধী কাজ করে। নিজেদের মনগড়া দর্শন তৈরি করে নিরীহ ছাত্রদের হত্যা করে। তাই তাদের ওই আখড়া থেকে উৎখাত করতেই হবে। ওই ফিনিক্স পাখিরা মরেও মরে না যদি না তারা নির্মূল হয়।

মেধা মাপা যায় না। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কৃতী বলা মূর্খামি। তাতে তাকে ঘিরে মোহ বাড়ে। অন্ধ যুক্তির পাল্লা ভারী হয়। নিরীহ এক ছাত্রের পিতার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। র‍্যাগিং নামে এক কুৎসিত মানসিক বিকারের শিকার হয়েছে ওই ছাত্রটি। বিশ্বের প্রথম ৪৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর যাদবপুরের নাম নেই। তবু মোহের চকমকি পাথর ঠুকে সেখানে ভর্তির হুড়োহুড়ি চলে। যাদবপুর ঘিরে এই অকারণ মোহ থেকে রাজ্যের মানুষকে বেরিয়ে আসতে হবে। বুঝতে হবে সব বিদ্যালয়ের মতো যাদবপুরও একটি শিক্ষালয়। তার কোনো ব্যতিক্রমী অস্তিত্ব নেই। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের লজ্জার ইতিহাস রাজ্যের মানুষের সামনে প্রতিদিন ভেসে উঠেছে। তা গ্রহণযোগ্য নয়। রাজ্যের প্রশাসন, পুলিশ আর সাধারণ মানুষকে তা বুঝতে হবে। তাদের ভাবতে হবে কেন রেহাই পাবে না সেখানকার দায়িত্বজ্ঞানহীন আর নির্লজ্জ কর্তৃপক্ষ।

যাদবপুরের আলমারিতে রাখা কঙ্কালরা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। ‘অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু শাস্ত্রে সেই মতো কয়’। একই রকমভাবে মাছ পচে যাওয়ার আগে তার মুড়ো পচে যায়। মুড়ো কেটে ফেলাই শাস্ত্রসম্মত। যাদবপুর ঘিরে যে ধরনের নোংরামি আর হিংস্রতা রাজ্যের মানুষ দেখছে। তা বন্ধ করার একটি উপায় হলো নিদর্শনমূলক শাস্তি। তা সে যে কোনো ধরনের-ই হোক না কেন। আমরা সবাই মিলে একটি নিরীহ ছাত্রকে হত্যা করেছি। তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে। তাতে যেমন শামিল মমতা প্রশাসন, তেমনি দোষী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, সেখানকার ছাত্র ইউনিয়ন আর সুযোগ সন্ধানী জনসমাজ। শাসক তোষণই এদের জীবিকা। সেই বুদ্ধিজীবীর দল এতদিনে রাস্তায় নেমেছে। তার কতটা সত্য আগামীদিনে তা বোঝা যাবে।

যাদবপুরে তৈরি হওয়া বিষবাষ্প আমাদের সকলে মিলে সরাতে হবে। সেখানকার পচা মুড়ো কাটতে হবে। ভারত সংস্কৃতি বিরোধী মুক্তাঞ্চলকে নতুন ভাবে মুক্ত করতে হবে।

যাদবপুরের হস্টেলে ৯ আগস্টের সেই ভয়াবহ রাতের অন্যতম প্রধান দোষীরা যেমন কয়েকটি মাতৃগর্ভের লজ্জা, একইরকম ভাবে দায়ী ছাত্র ডিন আর হস্টেল সুপার। ওই সব ছাত্র আর প্রাক্তনীদের কথা লিখতে ঘৃণা হয়। কিছু পশুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে ওই দুই কর্তা এখন বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাঁরা রেহাই পাবেন না। আর তা যদি না হয় বলতেই হবে মমতা প্রশাসনের শ্মশান যাত্রা ঘটে গিয়েছে। সেদিন রাতে ওই দুই কর্তা সত্বর ঘটনাস্থলে পৌঁছলে নদীয়ার ওই ছাত্রটির নির্মম হত্যা হয়তো আটকানো যেত। এদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বললেও দায়িত্ববোধের ধারণাটিকে লজ্জা দেওয়া হয়। এই দু'জনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কাজ থেকে বরখাস্ত করা উচিত।

পাপের সমুদ্রে ডুবে রয়েছে যাদবপুর আর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রমাণ। সেখানে ফুলের টবে গাঁজার চাষ হয়। পিতা-মাতার হোটেলে লালিত পালিত এক হঠকারী ছাত্রী সদম্ভে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় তার পিতৃ পিতৃব্যের ঘরোয়া ঘর। তারা ইচ্ছা মতো সে ঘর ব্যবহার করতে পারে। সেই ঘরকে যে কোনো ধরনের আলয়ে পরিণত করতে পারে। দুষ্ট গোরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। সে দায়িত্ব কেবল মমতা প্রশসনের হাতে ছাড়লে চলবে না। তাতে অন্য নৈরাজ্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাদবপুরে তৈরি হওয়া বিষবাষ্প আমাদের সকলে মিলে সরাতে হবে। সেখানকার পচা মুড়ো কাটতে হবে। ভারত সংস্কৃতি বিরোধী মুক্তাঞ্চলকে নতুন ভাবে মুক্ত করতে হবে। দেশের সেবায়, ভারতমায়ের সেবায়, সর্বোপরি ছাত্রদের সেবায় তা হবে সবচাইতে বড়ো প্রণামী।□

দুর্গা মা আসছেন

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আরাধনা হবে

ঋণ করে অনুদান দেওয়াই ভালো। কারণ, রাজ্যের ভবিষ্যতের আগে দেখা উচিত দলের ভবিষ্যৎ। দল থাকলে তবেই রাজ্য থাকবে। আর রাজ্য থাকলে তবেই উঠবে আপনার থাকার প্রশ্ন।

অনুদানেষু দিদি,

'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ'।

এই দর্শন ব্যক্তির পক্ষেও ঠিক কি না তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। তবে ব্যক্তির বিষয়টা ব্যক্তির। তিনি ঋণ করে ঘি খেয়ে হজম করতে পারলে আর কী বলার আছে? কিন্তু সরকারের পক্ষে কি সেটা শোভা পায়? প্রশ্ন উঠবেই। কিন্তু সুখ বলতে যদি ক্ষমতা বোঝায় তবে দিদি আপনি কিন্তু চার্বাকের দর্শনেই বিশ্বাস করেন।

কেন এই কথা বলছি সেটা বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদ হওয়ার দরকার নেই। আপনার বক্তৃতা নিয়মিত শুনলেই হয়ে যায়। এই তো সেদিন যখন রাজ্যের দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের জন্য অনুদান বরাদ্দ করার সময়ে আপনি বললেন, হাতে কিন্তু টাকা নেই। তাই অর্ধেক করে দেবেন। মানে গতবার পুজোয় দেওয়া ৬০ হাজার টাকাটা কমিয়ে ৩০ হাজার। তারপরে আপনিই বুঝিয়ে দিলেন রসিকতা করছেন। দিলেন বাড়িয়ে। এক লাফে ১০ হাজার টাকা বাড়ালেন। মানে রাজ্যের প্রতিটি পুজো কমিটি মানে ওই ৪৩ হাজারের মতো ক্লাব পাবে ৭০ হাজার টাকা করে। এর মধ্যে আপনি যেটা বলেননি সেটা কিন্তু সবাই জানে যে, এই ৪৩ হাজার ক্লাব আপনার দলের বশংবদ। তাদের বছরে এই টাকাটা দিয়ে চাঁদা তোলার ঝক্কি থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। প্রতিদানে আপনার কথামতো তারা রাজ্য জুড়ে 'বিরোধী ঠ্যাঙাও' কর্মসূচি পালন করে।

আসলে রাজ্যের অর্থনীতি এমন একটি বিষয়, যা প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে প্রভাব ফেলে, কিন্তু সেই তর্কের সত্যাসত্য যাচাই করার ক্ষমতা সব নাগরিকের সমান নয়। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে আপনি রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বসেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির 'প্রকৃত অবস্থা' আলোচনা করতে। তা থেকেই জানতে পারি, পশ্চিমবঙ্গ ঋণের ভারে কাবু। বিবেচনাহীন অনুদানের পথে হেঁটে রাজ্যের অর্থনীতির হাঁড়ির হাল হয়েছে।

গত এক-দেড় বছরে বার বার কেন্দ্রীয় সরকার এই কথা বলেছে। চিঠি পাঠিয়ে রাজ্যকে সতর্কও করে দিয়েছে। যাঁরা রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তিত, তাঁদের বেশি উদ্বেগ এ রাজ্যের ঋণের পরিমাণ নিয়ে। অর্থনীতিতে বলে, ঋণ কতটা বিপজ্জনক, তা নির্ভর করে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার উপরে। পরিশোধের সামর্থ্যের নিরিখে ঋণের বোঝার 'বিপদ' বিচার করার মাপকাঠি হলো রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে কত বেড়েছে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং রাজস্ব আদায়।

ঋণের পরিমাণ বাড়ছে মানেই বিপদ নয়। সব রাজ্যেরই ঋণ রয়েছে। দেখা দরকার ঋণের টাকা কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে আপনি দান খয়রাতির মধ্য দিয়েই বেশিরভাগ টাকা খরচ করছেন। রাজ্যে সেভাবে পরিকাঠামো তৈরি করায় মন নেই। যেটা করলে আগামীদিনে ঋণ পরিশোধের সুবিধা হতো। কারণ, পরিকাঠামো উপার্জন এনে দেয়। পরিকাঠামো তৈরি হলে রাজ্যের মানুষকে অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ খুঁজতে হয় না। মনে রাখতে হবে রাজ্যের উপার্জনশীল মানুষ অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া মানে সেই রাজ্যেই অর্থনীতিতে উন্নতি। পশ্চিমবঙ্গের বাজারে ওই মানুষদের অংশগ্রহণ থাকবে না।

তবে দিদি আমি বলি কী, ও সবে মন দিয়ে লাভ নেই। বরং, ঋণ করে অনুদান দেওয়াই ভালো। কারণ, রাজ্যের ভবিষ্যতের আগে দেখা উচিত দলের ভবিষ্যৎ। দল থাকলে তবেই রাজ্য থাকবে। আর রাজ্য থাকলে তবেই উঠবে আপনার থাকার প্রশ্ন। কারণ যা বুঝছি তাতে আপনার দিল্লি যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। সে গুড়ে বালি। সুতরাং, ঋণ চলুক।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে এই যে ক্লাবগুলোকে ৭০ হাজার টাকা করে দিয়ে দিলেন মানে কিনে নিলেন এর রিটার্ন কম নাকি! ওঁরা ভোটের সময়ে ঠিক সুদাসলে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু দিদি, এ রাজ্যের মানুষ কি সত্যিই ক্লাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? আমি জানি না। তবে এটা জানি যে, আপনি যখন বিনিয়োগ করছেন তখন রিটার্নের অঙ্ক কষেই করেছেন।

চিরকাল সর্বজনীন দুর্গাপুজোই ছিল বাঙ্গালির উৎসব। সর্বজনীন মানে সকলের। বারোয়ারি মানেও তো সেই বারো ইয়ারের পুজো। যেই বারো বন্ধু চাঁদা তুলে পুজো করবে। উৎসব সর্বজনীন হয়ে উঠবে। কিন্তু আপনি যা করে দিয়েছেন তাতে সব মণ্ডপেই লেখা থাকবে--- 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মাতৃ আরাধনা'। □

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

ধ্যানধারণা পরিবর্তনের সময় এসেছে

নতুন ভাবে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা হাজির করতে হবে, যে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংসদ ও বিচারবিভাগের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্মণরেখা পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত হবে। যে এক্তিয়ার বা অধিকারের সীমারেখা সংসদ বা বিচারবিভাগ অতিক্রম করবে না।

গভীরভাবে ইঙ্গিতবাহী হওয়ার কারণে আদালতের কিছু নির্দেশ প্রচলিত ও সর্বজনগ্রাহ্য আইনতত্ত্বের ওপর ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করে। তার উদাহরণ হলো ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ১৩ জন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহত্তর সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়। এই বেঞ্চ তার দেওয়া এই রায়ে জানায় যে, অন্যান্য সব বিষয়ের মধ্যে, কিছু বিশেষ সাংবিধানিক বিষয় রয়েছে যার পরিবর্তনে সংসদও অপারগ। সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রবর্তিত হয় ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর (Basic structure) ধারণা, যা ইদানীং বিভিন্ন মামলায় বহুল ব্যবহারে আজ হয়ে উঠেছে প্রায় অর্থহীন। প্রসঙ্গত, সংসদের সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও এক্তিয়ারের বিষয় অপেক্ষা বিচার বিভাগ দ্বারা ক্রমাগত সংবিধানের এই মৌলিক কাঠামোর নিত্যনতুন প্রায় এক অন্তহীন ব্যাখ্যা উপস্থাপনের বিষয়টি আজ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দেওয়া একাধিক রায়ে এর উল্লেখ করলেও এই মৌলিক সাংবিধানিক কাঠামোর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত বিশদে কিছু আলোকপাত করেনি।

গত মে মাসে সংশ্লিষ্ট আমলাতন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিষয়ে দিল্লি সরকারের পক্ষে রায় ঘোষণা করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানায় যে গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অঙ্গ। এহেন রায়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্রেক হয়। রায় অনুযায়ী বর্ণিত এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কি কেবল কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কেই সীমিত? রাজ্য ও রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির বিষয়ে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণার কোনো স্থান নেই? যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অঙ্গ হওয়ার কারণে কোনো পৌরপ্রতিষ্ঠান কি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে কোনোভাবে স্বায়ত্তশাসন দাবি করতে পারে? সংসদীয় গণতন্ত্র হলো ভারতের সরকার ও প্রশাসন পরিচালনার মূল পদ্ধতি। কিন্তু এহেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে যদি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর আখ্যা দেওয়া হয়, তবে তা কি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পদ্ধতি প্রণয়নে বিরত রাখতে সক্ষম?

দিল্লি সরকারের ক্ষমতা বিষয়ে গত মে মাসের সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের একটি নির্দিষ্ট অংশকে পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে এই সংক্রান্ত একটি বিল নিয়ে এলে এই বিষয়টি সংবাদ শিরোনামে পুনরায় স্থান করে নেয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এই প্রসঙ্গে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ধারণাকে একটি 'বিতর্কিত বিষয়' বলে ব্যাখ্যা করেন। এই বিষয়ে বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি গগৈয়ের বক্তব্যকে তার ব্যক্তিগত অভিমত বলে উল্লেখ করেন। এর আগে তিনি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে 'আইনতত্ত্বগত ধ্রুবতারা' আখ্যা দিয়েছিলেন। যদি এই দু জন সমসাময়িক প্রধান বিচারপতি (প্রাক্তন ও বর্তমান) সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বিষয়ে এইরূপ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে পারেন, তবে এটাই হয়তো সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ এবং সেই অর্থের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৌলিক কাঠামোকে এক যুক্তিগ্রাহ্য রূপদানের উপযুক্ত সময়।

একটু ইতিহাসের পর্যালোচনা করা যাক। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে ১৩ জন বিচারপতির বেঞ্চে ৭-৬ এর অতি স্বল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেশবানন্দ ভারতী মামলার রায় ঘোষিত হয়। তাছাড়াও, ১৩ জন বিচারপতি ১১টি পৃথক রায় দেন। সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী টি.আর. অন্ধ্যারুজিনার মত অনুযায়ী এই ১১টি পৃথক রায়ের সঙ্গে এতগুলি রায়ের কার্যকরী নির্যাস সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বিষয়ে সংসদের সংশোধনী পাশের এক্তিয়ার নেই— এইরকম কোনো কিছু এই ১১টি রায়ের মাধ্যমে কোনোভাবেই প্রতিফলিত হয় না। প্রসঙ্গত, এই ঐকমত্য বিধান করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এসএম সিক্রি, যিনি এই রায় ঘোষণার পরেই অবসর গ্রহণ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ওই বেঞ্চ ৬টি বিষয়ে একমত বলে তিনি প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করেন, যার মধ্যে ২ নম্বর বিষয়ের প্রস্তাবনায়

'সংবিধানের ৩৬৮ নং অনুচ্ছেদ সংসদকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের অধিকার প্রদান করে না' বলে মতপ্রকাশ করা হয়। বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের রায়ের এই সারসংক্ষেপ ১৩ জন বিচারপতির স্বাক্ষরিত রায়ের অংশ না হলেও বিচারপতিদের স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারপতি সিক্রির তরফে তা প্রকাশ্য আদালতে পেশ করা হয়। ৪ জন বিচারপতি যা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। খুব কমজনের সহজবোধ্য এই একাধিক জটিল রায়দান পদ্ধতির একটি বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবস্থাপনা বলে এই ঘটনাকে কেউ ভাবতে পারেন। কিন্তু সহজ সত্যিটা হলো যে এই রায়ের মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত কোনো ধারণা প্রতিফলিত হয় না। কেশবানন্দ ভারতী মামলার অনুরূপ একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ যদি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ধারণাটির একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করে, তবে ইদানীং নানা বিষয়ে বিচারবিভাগের অতিসক্রিয় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে এই কেশবানন্দ ভারতী মামলার রায়ের বহুল ব্যবহার একটি ভ্রান্ত প্রক্রিয়া।

জাতীয় রাজনীতির যে প্রেক্ষাপটে এই রায়দান হয়েছিল তাও মনে রাখার মতো। ইন্দিরা গান্ধী তখন ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মধ্যগগনে। দ্রুত গতিতে সংবিধান সংশোধনী এনে সরকারি প্রশাসনকে শক্তিশালী করে তাঁর সামাজিক কর্মসূচি রূপায়ণে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সেই সময়ে বিচার বিভাগ প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল এবং এই বিভাগের একটা বড়ো অংশ প্রশাসনের এই অবাধ ক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রেক্ষাপটে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অবতারণা ছিল সেই বিচারধারা সঞ্জাত।

কিন্তু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি কিছু ভুল আইনের জন্ম দিয়ে যায়। সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত ধারণা ছিল সেই অস্থির সময়ের এক ফলাফল এবং বর্তমান সময়ে এই ধারণার পুনর্বিচার ও ব্যাখ্যার আশু প্রয়োজন। সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী যা সাংবিধানিক মৌলিক ধারণার কিছু উপযোগী বিষয়, তার প্রতি বিচারবিভাগ কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি। আরোপিত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার (checks and balances) নীতি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্গত হওয়ার পক্ষে একটি অন্যতম উপযুক্ত বিষয়। তাহলে কীভাবে সর্বোচ্চ আদালত উচ্চতর বিচার বিভাগে নতুন বিচারক নিয়োগের অধিকার কুক্ষিগত করেছিলেন? যে মামলায় বিচারবিভাগ ছিল একটি অন্যতম পক্ষ, সেই ক্ষেত্রে বিচারবিভাগ ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস্ কমিশনকে (এনজেএসি) অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে কীভাবে খারিজ করতে পারে?

এনজেএসি মামলায় ভিন্নমতপ্রকাশকারী বিচারপতি জে. চেলেমেশ্বর বলেন যে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি মুখ্য ভূমিকায় না থাকলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। এই ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির মতামতের প্রাধান্যের বিষয়টি ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত নয়। এনজেএসি প্যানেলের অন্তর্গত বিচারপতিরা যদি বাকি সদস্যদের দ্বারা পছন্দ করা প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাখেন তবে তা যথেষ্ট।

কেউ ধারণা করতে পারেন যে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নকারী সংবিধান সভা বা গণপরিষদের সম্মিলিত চিন্তাধারাপ্রসূত একটি বিষয়। কিন্তু 'মৌলিক কর্তব্য' (fundamental duties) অধ্যায়টি সেই মূল সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা ৫১এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এই অধ্যায়টি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সংবিধানের ১২-৩৫ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সমূহের বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে এই ৫১এ অনুচ্ছেদে দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে ১১টি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে, সংবিধান বর্ণিত মৌলিক কর্তব্যের বিষয়সমূহও দৃঢ়ভাবে প্রয়োগযোগ্য, তবে সেগুলি খুব কমই হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, মূল সংবিধান প্রণয়নের সিকি শতাব্দী পরে তাতে নতুন কোনো আইনি সংস্থান গৃহীত হলে তা কি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? যদি এই প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ধারণা যে কোনো ইচ্ছানুযায়ী সম্প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হতে পারে বলে ধরা যেতে পারে। যদি এর উত্তর 'না' হয়, তবে কি এই সমস্যার উদ্ভব হবে না যেখানে সংবিধান থেকে শুধু অধিকার প্রবাহিত হয়, সংবিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নয়? দায়িত্বহীন অধিকার লাভ কি সম্ভব?

নতুন ভাবে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা হাজির করতে হবে, যে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংসদ ও বিচারবিভাগের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্মণরেখা পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত হবে। যে এক্তিয়ার বা অধিকারের সীমারেখা সংসদ বা বিচারবিভাগ অতিক্রম করবে না। ততদিন এই স্বচ্ছতার অভাবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ধারণা বিচারবিভাগ দ্বারা সংঘটিত একটি সাংবিধানিক অভ্যুত্থান বই কিছু নয়।

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্দেশক)

শোকসংবাদ

হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা শাখায় প্রবীণ স্বয়ংসেবক পঞ্চানন কুঁকড়ী গত ৮ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতিনিদের রেখে গেছেন। তিনি এক সময় শাখার মুখ্যশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বিশ্বের প্রতিটি মানুষ আদিতে হিন্দু ছিলেন

বরুণ মণ্ডল

যিশুখ্রিস্ট হিন্দু ছিলেন। শুধু যিশুখ্রিস্ট নয় মোহাম্মদ এমনকী এ বিশ্বের প্রতিটি মানুষ হিন্দু তথা সনাতনী। এমন মন্তব্যে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু তর্কবিতর্কের পথ ধরেই আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো। পুরীর শঙ্করাচার্যের দাবি, যিশু হিন্দু ছিলেন এমনকী তিনি ১০ বছর ভারতে কাটিয়েছেন। যে বছরগুলির সংবাদ খ্রিস্টান ধর্ম শাস্ত্রে অন্ধকারময় হয়ে রয়েছে। অথচ বিশ্বের বিশেষ কিছু লেখকের লেখনীতে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যিশুর অজ্ঞাতবাসে তিনি ভারতেই ১৭ বছর কাটিয়েছিলেন।

যেমন বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক ফেবার কায়সার তাঁর 'জেসাস ডায়েড ইন কাশ্মীর' গ্রন্থে লিখেছেন যে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তার দেহের ক্ষতগুলি শুকিয়ে গেলে তিনি তার মা মেরিকে নিয়ে ভারতের কাশ্মীরে চলে আসেন। যিশুর সঙ্গে তার শিষ্য টমাসও ছিলেন। কাশ্মীরে নাকি তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং পরিণত বয়সে তার মৃত্যু হয়। কাশ্মীরে শ্রীনগরের কাছে রোজাবেল গির্জার নীচে সমাধিগৃহে যিশুকে কবর দেওয়া হয়। সুলেখক ও পরিব্রাজক আর কে দাস তার বিশিষ্ট গ্রন্থ 'লেজেন্ডস অফ জগন্নাথপুরী'তে লিখেছেন, যিশুখ্রিস্ট পুরীতে এসেছিলেন। পুরী থেকেই তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায় চলে যান। যিশু যে অজ্ঞাতবাসের সময় ভারতে এসেছিলেন তার আরেকটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন সিরিয়াক বাইবেলে। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় থাকাকালীন একটি পুস্তক পড়ে যিশুর হিন্দু হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আমেরিকায় থাকাকালীন ড. নিকোলাস নটোবিচের বিখ্যাত বই 'দি আননোন লাইফ অব জেসাস ক্রাইস্ট' পাঠ করেন। নিকোলাস নটোবিচ একটি প্রাচীন দুর্লভ পুঁথি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্যতিব্বতের হিমিশ গুহার মধ্যে দেখতে পান। নটোবিচ বিখ্যাত হিমেশ গুহা তথা হিমিশ মঠে রক্ষিত যিশুর সমসাময়িককালে ভারতের প্রাচীন পালি ভাষায় রচিত এই অবিস্মরণীয় পুঁথি থেকেই যিশু তথা ইশার জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। যেখানে যিশুর ১৩ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত দিব্য জীবনের কথা পালি ভাষায় লিখিত রয়েছে। এই দীর্ঘ ১৭ বছর তিনি ভারতে অতিবাহিত করেন পরিব্রাজক হিসেবে এবং বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতে গিয়ে হিন্দু হয়ে যোগসাধনায় নিমগ্ন থাকেন। পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে তিব্বতের হিমেশ মাঠে এসে সেই পুঁথি দর্শন করেন এবং অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন।

তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে পুরীর গোবর্ধনপীঠের শঙ্করাচার্যের কথার সত্যতা মিলতে পারে। কারণ যিশুখ্রিস্ট একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। দু' হাজার বছর আগে খ্রিস্ট মতের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের আনাগোনা তো তারও আগে। তবে খ্রিস্ট মতের আগে মানুষ কি ধর্মহীন ছিল?

হিন্দু শাস্ত্রমতে পরমব্রহ্মাবতার শ্রীরামচন্দ্রকেও গুরু গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁর ছিলেন বশিষ্ঠমুনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও গুরু গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর গুরু ছিলেন সান্দীপনী মুনি। আর অসুরদের গুরু ছিলেন শুক্রাচার্য। বলা হয় শুক্রাচার্যের পথ ও মতকে অবলম্বন করেই ইসলাম তৈরি। প্রচার রয়েছে, পবিত্র কাবা ঘরে শুক্রাচার্যের পরমারাধ্য শিবলিঙ্গ রয়েছে। যদিও চরম বিতর্কিত মতামত। তথাপি জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কে জল ঢেলে হয়ে গেল জ্ঞানব্যাপী মন্দির। বাবরি মসজিদ সমস্ত বিতর্কে জল ঢেলে হয়ে উঠলো রামমন্দির। কথায় বলে, 'যাহা রটে তাহা কিছুটা ঘটে'। সুতরাং যিশুখ্রিস্ট বা মোহাম্মদ যে সনাতন হিন্দু ধর্মের ব্যক্তি ছিলেন তা বিতর্কিত হলেও অসম্ভব কিছু নয়।

হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবত গীতা ও ভাগবতম। এই দুই গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম বলে উল্লেখ করা নেই। সুতরাং খ্রিস্ট মতের প্রচারক যিশুখ্রিস্ট বা ইসলাম মতের প্রচারক মোহাম্মদ হিন্দু ছিলেন বলতে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কথা নয়। ওই দুই ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রেই সনাতন ধর্মের অনুসারী। সেই সনাতন ধর্মের কথাই ভগবত গীতা এবং ভাগবতমে বলা হয়েছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'সর্ব ধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ। 'এখানে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে 'সকল ধর্ম' কিন্তু তিনি শুধুমাত্র খ্রিস্ট, জৈন, ইসলাম এই সমস্ত মতের কথা বলেননি। কেননা শ্রীমদ্ভগবত গীতাজ্ঞান যখন অর্জুনকে দেওয়া হয়েছিল কিংবা 'ভাগবতম' গ্রন্থ যখন ঋষি ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন তখন বর্তমানের এই সমস্ত তথাকথিত ধর্মের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ ওই উক্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে না বলা' সমস্ত মত, পথকে পরিত্যাগ করে তাঁকে স্মরণ করতে বলেছেন।

শুধু খ্রিস্ট ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ মত ইত্যাদি গ্রহণ করে তাদের অনুসারী হতে হয়। তার জন্য তাদের নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে। কিন্তু জীব মাত্রই সনাতন ধর্মের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ সকল যুক্তি বিতর্কিত মনে হলেও সনাতন শাস্ত্রসমূহ মূলত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'ভাগবতম্' গ্রন্থ দুটি হৃদয়ঙ্গম করলে সমস্ত বিতর্কের অবসান হয়। ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীকৃষ্ণকৃপাশ্রী শ্রীঅভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই দুই গ্রন্থের ইউরোপীয় ভাষায় ভাষ্য রচনা করে ইউরোপীয়দের নাস্তিকতা এবং ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর করে সনাতন ধর্মে পুনরাগমন ঘটিয়েছেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করে লক্ষ লক্ষ মানুষ সনাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

তর্ক বিজ্ঞান শিক্ষা শাস্ত্রের এক উন্নততর শাখা। যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই বিখ্যাত তার্কিক ছিলেন। তাই পুরীর শঙ্করাচার্যের এই বিতর্কিত মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন হবে, এই আশা রাখা যেতেই পারে। □

যাদবপুরের একটি র‍্যাগিং মৃত্যু এবং একাধিক জিজ্ঞাসা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রবি ঠাকুরের অচলায়তনের আচার্য বচন মনে পড়ল। যখন তাঁর নিজেকে পাপলিপ্ত মনে হচ্ছে। তখন সন্ধ্যার গান উঠছে :

'পাপের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কী দেখা যায়?

নামবে কী সব বোঝা এবার, ঘুচবে কী সব দায়?'

এবং একই সুরে আচার্য বলেন— আমাদের গুরু আসবেন কবে। জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন...'

যাদবপুর কি একই কথা বলছে আজ?

র‍্যাগিং কি ছিল না আগে? ছিল। দুষ্টুমি, টুকটাক খ্যাপামি। একটু চটিয়ে দেওয়া আর এইসব করতে করতে অজান্তেই সবাই বন্ধু হয়ে ওঠে। একদিন আড্ডার আসর না জমলে দিনটা ঠিক জমে না। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দু' একটা সিনেমা না দেখলে, টি টি না খেললে কি আর কলেজে পড়ার ইউনিভার্সিটির বড়ো হওয়ার মজা থাকে? স্কুল ইউনিফর্ম থেকে কলেজ ইউনিভার্সিটির প্রথম ভালোলাগা— ওই যে একটু মাঞ্জা দিয়ে যাওয়া যায়। যখন সাবালক ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে যায়, তখন তার আদব কায়দা, স্বাধীনতা থাকবেই। একটু পাকামিও থাকে। একটু প্রতিবাদ, একটু নিজেকে হিরো ভাবা, একটু বেশি স্বপ্ন— সবটাই থাকে পড়াশোনার সঙ্গে। কিন্তু গাঁজা? প্রকাশ্য মদ্যপান? অশ্লীল (যদিও তা বড়োই আপেক্ষিক) দেহ ভঙ্গিমা, কানে ভোঁ ভোঁ লাগার মতো অনর্গল অশালীন কথা এবং তাতে কোনো লিঙ্গ ভেদাভেদ ও পারস্পরিক রাখঢাক নেই। নিষিদ্ধ আরও অনেক কিছুই চলছে একটা শিক্ষাঙ্গনে, কারণ তারা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কিনা! নিষিদ্ধ ও দেশদ্রোহী রাজনৈতিক সংগঠন থেকে শুরু করে নিষিদ্ধ নেশা, নিষিদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের নৈকট্য, নিষিদ্ধময় সন্ধ্যা একটা ক্যাম্পাসে। তখন তো সেই অচলায়তনের আচার্যের মতোই বলতে হয়, কবে আসবে কাণ্ডারি এই সব পাপ হরণ করতে?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত নিষিদ্ধ কারবারের তালিকা এতক্ষণে আমাদের সবার হাতেই চলে এসেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষিদ্ধ কাণ্ডগুলি যদি অতি স্বাধীনচেতারা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখত। যাকে বলে এক গোয়ালের গোরুরা একসঙ্গে থাকত তাহলেও ছাত্র নির্লজ্জতার ব্যবহারিক বীভৎসতার এই অমানবিক রূপ ধরা পড়ত না। এইসব এঁচড়ে-পাকা উচ্ছন্নে যাওয়া ছাত্ররা তাদের চক্রব্যূহে সবাইকেই টানতে চায়। বিশেষ করে যারা একটু নিরীহ, যারা তখনও গালিগালাজে, মুক্ত অবাধ যৌনতায়, বিকৃত কামে 'স্মার্ট' হয়নি। তাদের ওপর চলে পাশবিক মানসিক নির্যাতন। বিকৃতপনা চাপিয়ে দেওয়ার ট্রায়াল চলে ছাত্র আবাসনে। সেই অসহ্য বিকৃতিতে মৃত্যু হয় মেধাবী মফস্‌সলের সাদামাটা বাড়ির স্বপ্নদীপদের।

> "যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা, ক্যাম্পাস কালচারে সংস্কারটাই হবে প্রকৃত বিপ্লব যা করতে পারে 'অযান্ত্রিক' মনন, সূক্ষ্ম ভাবনা, সংবেদনশীল ব্যবস্থা।"

স্বপ্নদীপের মৃত্যু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পাষণ্ড, হিংস্র, বিকৃত, নেশাখোর, পথভ্রষ্ট সিনিয়র ছাত্রের অত্যাচারে। মৃত্যুটা হলো তাই কি আমরা সবাই নিশ্চিত হলাম? হ্যাঁ ক্যামেরা বিতর্ক সভা। সবাই নাক সিঁটকাচ্ছে। ঢি ঢি রব উঠছে। যদি মৃত্যু না ঘটত। যেমন ভাবে অসংখ্য স্বপ্নদীপ ভিতরে ভিতরে রোজ মারা যায়। মারা যেতে বাধ্য হয় ক্যাম্পাস বেলেল্লাপনার চোটে, ক্যাম্পাস ব্যবহারে, ওভার স্মার্টদের টিপ্পনী, মন্তব্যে। অসংখ্য অভব্যতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার ভারে তারা মানসিক ভাবে ক্লান্ত হয়। কে নেবে তার দায়? এতদিন ধরে তাই-ই হয়ে এসেছে এই ক্যাম্পাসে এবং এইরকম বেশ কিছু তথাকথিত নামি-দামি প্রতিষ্ঠানে। মার্কসিটের ওজন কি একদল ছাত্রকে বেলেল্লাপনার ছাড়পত্র দেয়! শিক্ষাঙ্গনটা মদমত্ততার প্রাঙ্গণ নয়। ওটা মুক্ত অবাধ যৌনাচারেরও লীলাভূমি নয়। ওখানে ইচ্ছেমতো যে যেমন খুশি আসবে যাবে তাও হয় না। সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গনে প্রকাশ্যে এমন অনেক আচরণই বেমানান যে আচরণ ময়দানে মানানসই। কিংবা লেকের পার্কে মানানসই। সেই ন্যূনতম রুচিবোধ, শালীনতাবোধ এবং অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের দায়বোধ কোথায় ছিল?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা হবে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থে গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ চলবে। বেশ ভালো ভালো ছাত্র তৈরি হবে। বিলেত যাবে। পাকাপোক্ত প্যাকেজের চাকরি হবে। এসব নিয়ে আতিশয্যের কোনো কারণ ঘটেনি তো। তার জন্যই তো বিশ্ববিদ্যালয়। তাই কী কী ক্যারিয়ার সাফল্য আনল একটা বিশ্ববিদ্যালয় তা নিয়ে আমরা খুব বেশি গদগদ নই। বরং লজ্জিত স্তম্ভিত এমন নাম উঁচু ক্যাম্পাসে কেমন করে বছরের পর বছর ধরে কুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতি তার পোক্ত আসন করে নিল। কেমন করে একটা প্রতিষ্ঠানে নেশা এবং বিকৃতর সব রকম ক্ষুধা তার প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা করে নেয়। এবং তাদের আসন মজবুত করে বছরের পর বছর ধরে ছাত্র সংগঠনের দাপটে থাকা বাম, অতিবাম এবং বেশ কিছু দাদা সংগঠন যারা স্বাধীন সংগঠন ও অতি বাম ঘরানার। এই সকল সংগঠন সম্বন্ধে তারা ছাড়া আমার মনে হয় খুব কম জনেরই সম্যক ধারণা আছে। কারণ এদের মাঝেসাঝে 'ভারত তেরি টুকরে হোঙ্গে' গোছের কিছু বলা বা ট্যাঁরা পিটিয়ে 'ইনসাফ ইনসাফ' করে বাঁদরের মতো লম্ফ ঝম্ফ করা, গাঁজা খেয়ে 'আজাদি আজাদি' বলা ছাড়া আর তো কোনো অ্যাজেন্ডা নেই।

সমাজের যে কোনো প্রগতিশীল গঠনমূলক কাজে এই সব বিপ্লবীরা কর্পূরের মতো উবে যায়। রাজ্যে যখন এত অনাচার তখনও এইসব বীরপুঙ্গব মুখেই মারিতং জগৎ বিপ্লববাদীদের টিকিটাও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিপ্লবের অভয়ারণ্য হলো ক্যাম্পাসটুকুই। যেখানে স্বেচ্ছাচারিতার

নামে চলে জঙ্গলরাজ। এবং সেই স্বেচ্ছাচারিতায় পাছে একটু ভাটা আসে, তাই নজরবন্দি ক্যামেরা বসানোর প্রসঙ্গ উঠলেই আবার মাথার চুল ঝাঁকিয়ে আজাদি লেখা কালো টি-শার্ট পরে, পারলে দুটো গাঁজার টান বেশি দিয়ে আবার ড্রাম বাজিয়ে গাছের তলায় প্রতিবাদে মুখর হয়। এ আসলে বিপ্লব নয়। এ হলো অক্ষমের কান্না। ওরা উদাহরণ দিচ্ছে আইআইটিগুলির স্বাধীনতার। ওদের বলি, হ্যাঁ, ভারতের উচ্চশিক্ষার অহংকারের প্রতিষ্ঠান প্রতিটা আইআইটি-তে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। রয়েছে লিঙ্গ সাম্য। আছে অবাধ মেলামেশার সুযোগ বিশেষ করে গবেষণারতদের। তা পূর্ণ সমর্থন করি, কারণ সেই স্বাধীনতাটার একটা হিসেব রাখা হয়। লিঙ্গ ভেদাভেদ ব্যতিরেকেই প্রতিটা হস্টেলে কে কখন ঢুকছে, কার কাছে কোন কক্ষে যাচ্ছে, কখন বের হচ্ছে তা অনুপুঙ্খ ভাবে রেজিস্টারে নিবন্ধিত হয়। সেখানেও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা। একটা স্তরের পর তা সমর্থনযোগ্য এবং অনেকের মতে প্রয়োজনও, বিশেষ করে অতি উচ্চ শিক্ষায়, যখন একজন গবেষক বা ছাত্র তার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজেই নিতে জানবে। কিন্তু তাঁরা আজাদির স্লোগান তোলেন না। সেখানে বিপ্লবের নামে ইচ্ছেমতো বহিরাগতরা বেলেল্লাপনা করতে পারেন না। সেখানে মাদক সেবন প্রকাশ্যে হয় না। সেখানে যাদবপুরের মতো রাজপথে চুম্বন বিপ্লব চলে না। কেন্দ্রীয় গবেষণাগার শিক্ষাঙ্গনের যাদবপুরকে বা কোনো রাজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এক আসনে রাখলে তা ভুল পরিমাপ হবে। প্রতিটা কেন্দ্রীয় শিক্ষাঙ্গন, গবেষণাগার, ক্যাম্পাস প্রশাসনিক নিয়মের হিসেবে ছাত্র স্বাধীনতার সুযোগ দেয়। তাই তা প্রকাশ্য বেলেল্লাপনার আর ক্রান্তি দলের চত্বর হয় না। এই মৌলিক পার্থক্য যাদবপুরের অতি বিপ্লবীদের জানতে হবে। দরকারে প্রত্যক্ষী হতে হবে কেন্দ্রীয় গবেষণার এবং টেকনলজির ক্যাম্পাসের সঙ্গে।

স্বপ্নদীপের র‍্যাগিং ও মৃত্যু বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশাসনিক অব্যবস্থার ছবি স্পষ্ট করছে। বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে কখনও জোটবদ্ধ প্রতিবাদ চোখে পড়েনি ক্যাম্পাস বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে। একদল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধন দিয়েছে, বাকিরা মানিয়ে নিয়ে বেতন গুনেছে। যদি ধরেও নিই ছাত্র রাজনীতির সবাই বিকৃতির শিকার নয়। অনেক ছাত্রই আছেন যারা চান ক্যাম্পাসটা যেন ভদ্রতার ন্যূনতম শিক্ষাটাও বজায় রাখে। তারাও সমবেত মুখরিত 'হোক কলরব' কেন করল না? এ যে আজব কাণ্ড! যারা হোক কলরবে ক্যাম্পাসে পাখির কাকলি স্তব্ধ করে দেয়, রাজ্যপালের প্রবেশাধিকার যারা নিয়ন্ত্রণ করার জোর রাখে, সমাবর্তনে যে ক্যাম্পাসের ছাত্রী বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হয়ে রাজ্যপালের থেকে কাগজ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, সেইসব কলরবি কণ্ঠ কি অপেক্ষারত ছিল কবে প্রাণে মারা যাবে একজন ছাত্র? ওই কলরবিরা নেশা, বিকৃতপনা ও নিরীহ ছাত্র অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন সোচ্চার হয় না? মাদকবিরোধী, র‍্যাগিং বিরোধী ক'টা ডেপুটেশন দেখাতে পারবে? কর্তৃপক্ষের নিকট ক'টা চিঠির কপি দেখাতে পারবে এই অগাধ অনাচারের বিরুদ্ধে? শুধুমাত্রই ক্যামেরার সামনে আজকে মুখ পরিচিতিতে ব্যস্ত থাকলে যে হবে না। আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই সাধু সাজতে চাইছেন। সবাই নিষ্কলঙ্কের দাবিদার। কিন্তু সেই সবাইরা যে চোখের সামনে ঘটে চলা অসংখ্য অসভ্যতায় নিষ্ক্রিয় তা কিন্তু বলতে শুনলাম না কাউকে।

স্বপ্নদীপের মৃত্যু আসলে শুধুই মৃত্যু নয়, এ ছিল ক্যাম্পাস বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত ফল। যা অসংখ্য ছাত্রকে নির্লজ্জতার জ্ঞান সম্বন্ধে দিগ্‌বিদিক শূন্য করেছিল। এই ঘটনার পরেও অসংখ্য ছাত্র এখনও লজ্জিত নয়। নয় বলেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে অনেকে ভরা ক্যামেরার মাঝে বলতে পারে— ক্যাম্পাসে নেশা করাটা তাদের অধিকার। গণতন্ত্রবোধ, স্বাধীনচেতার ছদ্মবেশে দৃষ্টিকোণ যে কোথায় অধঃপতিত এবং সে বদভ্যাসে যে আস্ত একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটা আনাচ কানাচ অবিচলিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হ্যাঁ, বুঝেছি সবাই প্রকাশ্য মদ্যপান করে না। কেউ গাঁজা টানে, কেউ অন্য মাদক, কেউ মদ্যপান আবার অনেক গুণধর মেধাবী সবকটাই। কিছু কিছু হাতে গোনা জন ধরেই নিলাম বিরত থাকে। কিন্তু বেশিরভাগই দলে থাকে। বাকিরা জীবিত থাকলেও মনের বিরক্তি আক্রান্তে আক্ষেপে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়। দলছুট হয়। পালাতে চায় মফস্‌সলের দিকে। কিন্তু যাদবপুর ছেড়ে সেখানে ফিরলে যে সুযোগ আর মান দুটোই খুইবে। তারা জীবন্মৃত হয়ে থাকে। মরতে থাকে অসংখ্য সম্ভাবনা। ছটফটে হাসিখুশি মনগুলো রোজের এই অসভ্যতা, অশ্লীলতা, ভাষা অপসংস্কৃতি, পোশাক জংলিপনা, নারী পুরুষের বৈঠকি নেশা এবং আরও অসংখ্য হজম করতে না পারা দৃশ্য, ঘটনা, ব্যভিচারিতার মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। এমনটাই দশা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে এই সকল নিঃশব্দ অত্যাচারের কথা কারোর সঙ্গেই বলার জো নেই। হাসবে সবাই। বলবে ক্যাবলা হরি এল আমার! কর্তৃপক্ষ তো সুবোধ বালকের মতো ছেলে-মেয়েদের এই অভব্যতার সামনে মাথা নুইয়েছে। তাই সেখানেও যে এক-একটা স্বপ্নদীপ অভিযোগ করবে সে উপায়টাও নেই। তাহলে কে নেবে এমন অসংখ্য স্বপ্নদীপের স্বপ্ন না ফুরানোর দায়? বিশ্ববিদ্যালয় এত মেপে ছেঁকে বাছাই করা ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দেয়। কিন্তু তাদের চরিত্র ও মনন সুরক্ষার ব্যাপারে এমন ফসকা গেরো কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়কে জবাব দিতে হবে তাদের দায়বদ্ধতা ঠিক কতদূর পর্যন্ত এবং মাথা কতদূর পর্যন্ত বিক্রি রয়েছে এই বিকৃত বিপ্লববাদের কাছে। এমন সব বিপ্লবী এই ক্যাম্পাসে যারা ড্রাম বাজিয়ে আজাদি বলতে বলতেই ঠিক সময়েই ক্যাম্পাসিংটা সেরে ফেলে। সুযোগ খোঁজে কখন বিলেতে পাকা চাকরিটা পাওয়া যায়। এরা এতটাই দ্বিচারী যারা 'আফজল তেরে কাতিল জিন্দা হ্যায়... সরমিন্দা হ্যায়' বলতে পারে কিন্তু স্বপ্নদীপের কার্তিলের জন্য মৃত্যুদণ্ড চায় না। এইসবের মধ্যেই বিতর্কের মোড় কিন্তু ঘুরে গেল অন্যদিকে। টের পেয়েছি কি আমরা? এখন বিতর্ক ক্যাম্পাসে নজরবন্দি ক্যামেরা বসবে কী বসবে না তাই নিয়ে। এটা কোথাও গিয়ে মূল ঘটনার থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর কৌশল। কেন? কারণ বিশ্ববিদ্যালয় একবারও এটা স্পষ্টভাবে বলছে না— কোন কোন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে বৈধ এবং কোনগুলি নয়। মাওবাদী এবং তার পন্থী সংগঠন যে এই দেওয়ালের ওপারে আছে তা প্রকাশিত। কে দেয় এদের সুরক্ষিত থাকার আশ্বাস? জানতে চাই আমরা সবাই। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন রাজ্য মাও মুক্ত। কিন্তু একি কাণ্ড! খোদ রাজধানীর বুকে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়েই যে ঘাপটি মেরে সংগঠন করছে মাওবাদীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে যাদবপুর থানা। পুলিশ প্রশাসন কি সত্যিই কিছু খোঁজ রাখেনি? তবে তো বলব রাজ্য ইন্টেলিজেন্স কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় ঢলে।

বিশ্ববিদ্যালয় এখনও স্পষ্ট করল না— একজন ছাত্র মানসিক ভাবে নির্যাতিত হলে সে কোথায় গেলে সুরাহার পথ পাবে। র‍্যাগিং কিন্তু শারীরিক নির্যাতন বা যৌন নির্যাতন নয়। যেটা স্বপ্নদীপের সঙ্গে ঘটেছে তাকে তথাকথিত র‍্যাগিং বললে মাত্রাকে ছোটো করা হবে। ওটা ছিল পাশবিক অত্যাচার। ওই মাত্রার নির্যাতন ছাড়াও আরও এমন অনেক নির্যাতন চলে এইসব ওভার স্মার্ট ক্যাম্পাসে যার প্রমাণ মেলে না, যা হাজার নজরবন্দি ক্যামেরাতেও ধরা যাবে না। কিন্তু যার প্রভাব মনের ওপর পড়াশোনার ওপর, স্বস্তির ওপর, সুদূরপ্রসারী। ছাত্র আবাসনের কক্ষে তো আর বিধিগত এবং নৈতিক নিয়মেই ক্যামরা বসানো যায় না। তাই সেই কক্ষেই চলে

অসংখ্য অনৈতিক আচরণ। যার প্রমাণ মেলে না। কিন্তু অভিযোগ করলে কী কী পদক্ষেপ নেবে কর্তৃপক্ষ তা পরিষ্কার নয়। অন্ততপক্ষে 'আনস্মার্ট' ছেলেগুলোর কক্ষ অবস্থান পরিবর্তনটুকু করার দায়িত্ব নেবে কি? বা কক্ষ সংলগ্নে অতিরিক্ত সুরক্ষা কর্মী নিয়োগ? অসভ্যতার বদভ্যাস যেভাবে তার শিকড় পোক্ত করেছে তাতে উচিত প্রতি আবাসনে পুলিশ পোস্ট তৈরি করার। এবং এমার্জেন্সি টোল ফ্রি নাম্বার যা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেবে। করছি করব গড়িমসির ক্ষেত্র কিন্তু এটা নয়। এখনই কেউ কেউ বলে উঠবে বেশি বাড়াবাড়ি করছি। না, কমরেড করছি না। মনে পড়ে আজ থেকে বহু বছর আগের কথা। সময়টা আনুমানিক ১৯৯৪ হবে, তখন উপাচার্য ছিলেন ড. সুবোধ সোম। তিনিই বোধহয় শেষ উপাচার্য যিনি শক্ত হাতে আবাসিকদের জন্য বেশ কঠোর (নিয়ন্ত্রিত) নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ চালু করেছিলেন। তার মানে বেলেল্লাপনার ডানা উড়ছিল। ডানা ছাঁটার কাজ তিনি শুরু করলেও তা আর বাস্তবে টেকেনি, কারণ বিশাল 'আজাদি' কোম্পানি এখানে রয়েছে। তারা কলেবরে আরও বেড়েছে। তাই সবার আগে কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট করতে হবে র‍্যাগিং (মানসিক শারীরিক এমনকী তাৎক্ষণিক অপ্রামান্য হলেও) মুক্ত ক্যাম্পাসের স্বপক্ষে তাঁরা কী কী প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে কী কী সহযোগিতা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো তা জানার অপেক্ষায়। নজরবন্দি ক্যামেরা একান্তভাবে দরকার কিন্তু তা র‍্যাগিং না মাদক কালচারে রাশ টানতে? খোলা মাঠে ব্যভিচারে একটু লজ্জা আনতে এবং ক্রান্তিকারিতার নামে বহিরাগতদের অবাধ অনুপ্রবেশ ও দাদাগিরি ঠেকাতে তার একান্ত প্রয়োজন। আজকে তৃণমূল যুব কংগ্রেস বেজায় উত্তেজনার নাটক করছে। যেন সব রসাতলে গেল। এও এক কৌশল। কেমন করে দৃষ্টি ঘোরানো যায়। অতিরিক্ত নাট্যকার হতেই হচ্ছে, কারণ প্রশাসনিক দায় যে ওদের, পুলিশ ব্যর্থতাটাও ওদের। শিক্ষামন্ত্রীও ওদের। এ রাজ্যের বিরোধীদের গাঁজা কেস পেতে এক মুহূর্ত সময় লাগে না কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনের পর দিন মত্ত মাদকতায় একটা ক্যাম্পাস পাড়া বুঁদ সে ব্যাপারে একটাও শব্দ নেই। চিৎকার চেঁচামেচি কোলাহল হঠাৎ ক্যামেরা পেয়েই ওভারড্রামা, অন্তর্বস্ত্র প্রদর্শন করে লাঞ্ছিতা হওয়ার প্রমাণ এবং আরও অনেক অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক নাটক তারা করে চলল। শিক্ষাঙ্গনের অধঃপতনের দায় কী করে শাসক দল এড়াবে? এই ওভারড্রামাই কি তবে শেষ ভরসা? আর কি কোনো শানিত যুক্তি তবে নেই? কেন! ওরা পদত্যাগ চায় শিক্ষামন্ত্রীর। একটা ছেলের প্রাণ গেল, অসংখ্য ছেলের স্বপ্ন নিভেছে যার পরিসংখ্যান হয় না। তার দায় নিক শিক্ষামন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন ওটা 'আতঙ্কপুরী', তারমানে তিনি অবগত ছিলেন প্রাঙ্গণের অপসংস্কৃতি এবং অবৈধ কারবার কতটা মজবুত।

তিনি এও বললেন— তিনি সেখানে যাবেন না। কিন্তু তিনি তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উত্তর দেওয়ার দায়ভার এড়াতেই কি এই একদল অনভিজ্ঞ যুব তৃণমূলের ছেলেপুলেকে হল্লা করার জন্য মোতায়েন? একটু ভেবে দেখি না এই দৃষ্টিকোণে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির বেশিরভাগটাই পচনশীল। তারা না জানে জাতীয়তাবোধ, না শিখেছে রাষ্ট্রনীতি। তারা এক একটা রাজনৈতিক ছাত্র। যারা জানে কেমন করে আত্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছাত্র হওয়া যায় এবং কিছু সুবিধা কায়েম করা যায়। যে ছাত্র সংঠনের ভয়ে 'মাস্টারমশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি।' বরং একদল মাস্টারমশাই প্রচ্ছন্ন মদত দেয়। স্বপ্নদীপের মতো নিরীহ ছেলেগুলো সেইসব শিক্ষকদেরও অনেক সময়ই কাছের হয় না। যেসব শিক্ষক ক্যাম্পাসটাকে চাকরির জায়গা মনে করেন, যাদের শিক্ষাসুলভ আচরণের লেশ মাত্র নেই, যারা মুক্তমনা বলতে ছেলেদের সঙ্গে মাত্রাজ্ঞানবর্জিত চটুল আড্ডা বোঝেন, কিন্তু চর্চিত হয় না এই ক্যাম্পাস ছিল ঋষি অরবিন্দের স্বপ্ন। যারা ছাত্রদের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটক কিংবা নাটক কবিতার আড্ডা দেন না, বন্ধুত্ব হয় না ক্যারামের গুটিতে কিংবা হঠাৎ একটা 'চল ফুটবল খেলি' বলে। কিন্তু তালে তালে টুকটাক নেশায় দিব্যি চলে 'স্মার্ট' বন্ধুত্ব। সেই একশ্রেণীর শিক্ষকরাও স্বপ্নদীপদের অনেক সময়ই তাচ্ছিল্য করেন, অবজ্ঞা করেন। যার প্রমাণ দেওয়া কঠিন কিন্তু সেই বোঝে যে মফস্সলের একটু ইনট্রোভার্ট ছেলেটা সেটা রোজ বইছে।

শুধুমাত্র স্বপ্নদীপের হত্যাকারীদের শাস্তি দিয়ে যদি উপরিউক্ত আলোচ্য বিষয়গুলি এড়িয়ে যাওয়া হয় তবে সংস্কারের দরবারে তা হবে ব্যর্থতা এবং আমাদের সামনে সান্ত্বনা। আর তো কোনো বোঝাপড়ার সুযোগ নেই। এবং কিছু মুষ্টিমেয় ব্যতীত প্রতিটা শিক্ষাঙ্গণেই যে কম-বেশি বেলেল্লাপনার প্রশ্রয় চলছে তাও অনুমেয়। প্রতিবাদের জড়ত্ব আমাদের কেবল বিফল করে না আমাদের চারিত্রিক ভাবে নপুংসক করে তোলে। পুঁথির ভার নিয়েই দায় এড়াতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয়, হৃদয় ও মন গড়ার দায়িত্বটাও তার। অন্তত সুরক্ষিত রাখার। না, একে মিস্টিসিজম বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ছাত্রদের হৃদয় যখন নবীন, কৌতূহল যখন সজীব, সমগ্র ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখন তাকে রক্ষার দায়িত্বটাও সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার।

উচ্চশিক্ষার পর স্বভাব দোষে তবে কি এইসব অভদ্র ছাত্ররা বলবে

'যে বিদ্যা দিয়েছ মাগো ফিরে তুমি লও,
কাগজ কলমের কড়ি আমায় ফিরে দাও।'

যারা শিথিল প্রশাসনে উল্লাস করে আজ ক্যাম্পাস বেলেল্লাপনাটাই করছে, তারা কালকেও সমাজে, সংসারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই নৈতিকতার স্খলন ঘটাবে। একটা শিক্ষাঙ্গন যদি তার দায়িত্ব পালন না করে তার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। তখন সমাজে হিপোক্রেট ক্রুয়েল কোয়ালিফায়েড বাড়ে, বাড়তেই থাকে কিন্তু প্রকৃত এডুকেটেড কমতে থাকে। ছাত্ররা যেন ভুলে না যায়, ২০১৯-এও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সময় ক্যাম্পাসে বুঁদপনা ঠেকাতে হলফনামা নিয়েছিল। কিন্তু আজ বুঝলাম সবটাই আই ওয়াশ। সমাজের বাকি মানুষ সেটাই করবে যেটা একটা উচ্চমানের শিক্ষাকক্ষ করছে। তাই র‍্যাগিং এবং মাদকাশক্তকে সামাজিক ব্যাধি বলেও যেন এড়ানো না হয়। এই ব্যাধির আঁতুড়ঘর ও মদতঘর এইসব উচ্চমানের শিক্ষাঙ্গন। এদের দেখেই মহামারীর মতো বেলেল্লাপনা প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা গুটি গুটি পায়ে ছড়িয়ে যায় মফস্সলে, গ্রামে। দায় থাকুক সবার যারা অসভ্যতা করে, যারা নীরবে মদত দেয়, যারা নিঃশব্দে করে শুরুতে ও শেষে সেইসব অতি সংগ্রামী দাদা সংগঠন ও তাদের দোসর কিছু শিক্ষকমহল, উদাসীন কর্তৃপক্ষ, রাজ্য প্রশাসন। এবং তারপর যেটুকু অবশিষ্ট সে দায় থাকুক নজরবন্দি ক্যামেরার ওপর। মনে রাখতে হবে, যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা, ক্যাম্পাস কালচারে সংস্কারটাই হবে প্রকৃত বিপ্লব যা করতে পারে 'অযান্ত্রিক' মনন, সূক্ষ্ম ভাবনা, সংবেদনশীল ব্যবস্থা। ছেলে-মেয়েরা স্বাধীনতার নামে ব্রেন ওয়াশড হয়ে সব ঠিক-বেঠিকের তফাত ভুলে গেছে। তারা সাবলীল কতটা জানি না কিন্তু অভদ্রতায় আত্মসুখে আনফিল্টার্ড কথায় এবং স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতাকে একাকার করার ওস্তাদ দল। সেই পথভ্রষ্ট ছাত্রদের সংকটমুক্ত করা এতটা সহজ কাজ নয়। এক স্বপ্নদীপের খুনিদের শাস্তিতে এর সমাধান কি আদৌ হবে? এই ক্যাম্পাস রুচির ঘরে এতটাই আপোশ করে বসে আছে যে তার থেকে উত্তরণ মানে তা সত্যিই আগামীর অনেক স্বপ্নের দীপ জ্বালাবে।

(এই নিবন্ধে নিগ্রিহীত মৃত স্বপ্নদীপের নাম উল্লেখ করা হলো। যদিও তিনি নাবালক এবং পসকো আইনানুগ নাম উল্লেখ করা যায় না। কিন্তু অসংখ্য সময় সংবাদ শিরোনামে নামটি প্রকাশিত, চর্চিত। তাই এক্ষেত্রেও উল্লেখ করা হলো।)

কর্মযোগী হও— এটাই শ্রীকৃষ্ণের বাণী

রবিব্রত ঘোষ

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে ব্যতিক্রম। সচরাচর দেবতা, ধর্মগুরু বা ধর্ম প্রচারকদের যে জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় শ্রীকৃষ্ণের জীবন তার সঙ্গে কোনোভাবেই মেলে না। ক্লাসিকাল ধর্মগুরুদের জীবনটা কীরকম? অত্যন্ত অন্তর্মুখী শান্ত, সৌম্য, চঞ্চলতাবিহীন, সহজ সরল জীবনযাপন। মানুষকে উপদেশ দেওয়া, রিপু দমন করা ইত্যাদি। নিজের জীবন ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে সিরিয়াস। সেইসঙ্গে কখনোই বেশি মাত্রায় হাসি তামাশা হইচই করেন না। মানুষের সঙ্গে সেভাবে মেশেন না।

এবার শ্রীকৃষ্ণকে দেখুন, বাল্যবয়স থেকেই ননি চুরি করছেন, গোপবালকদের সঙ্গে হইহই করছেন। গোপীদের সঙ্গে নাচ-গান আনন্দ করছেন। আর আজকের ভাষায় বলা যেতে পারে ভীষণ রকমের দুষ্টুমি করছেন গোপীদের সঙ্গে। পরবর্তীকালে সখা অর্জুনের সঙ্গে হাসি-তামাশা, বন্ধুত্ব সবই করছেন। গীতায় বলা আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তখন শুরু হবে, কৃষ্ণ অর্জুনকে দেখাচ্ছেন ওই দেখো কৌরব ও পাণ্ডবদের। অর্জুন যুক্তি দিয়ে বলছেন এই যুদ্ধ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ দিশাহারা অর্জুনের দিকে তাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মুচকি মুচকি হাসছেন।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন গীতার প্রথম অধ্যায়ে ৪৬ আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০টি শ্লোকে অর্জুন বলেই চলেছেন। যুদ্ধ না করার জন্য যুক্তি দিয়ে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সব শুনলেন, হাসলেন তারপর অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতো মূল সমস্যা ধরলেন আর বললেন, তোমার কথা ও কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই। পণ্ডিতের মতো কথা বলছ বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা এমন চিন্তা করেন না, এমন কাজও করেন না। আসল কথাটা হলো— তুমি ভয় পেয়েছো।

এসো সাহসী হও। সাহসে ভরপুর হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। যুদ্ধে জয়লাভ করো। এটাই গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম উপদেশ।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রর প্রধান বৈশিষ্ট্য হাসি-আনন্দ-তামাশা, গোপীদের নিয়ে

নাচগান সব আছে। কিন্তু সমস্যা এলে তাকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, বরং তার মুখোমুখি হতে শেখানো। যুদ্ধ করতে মানা করবেন না বরং যুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুত নিতে বলবেন। এর সঙ্গেই মনকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে এক উন্নত অবস্থায় নিয়ে যাবেন। গোপীদের সঙ্গে রাসলীলার কথা মনে করুন, দেখবেন একটা সময় গোপীরা নিজেদেরই শ্রীকৃষ্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনকে পালটে দিতে পারতেন।

এর সঙ্গে লক্ষ্য করুন নিজের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের আদর্শকে কীভাবে বহন করে নিয়ে চলেছেন। তাকে দু-দুবার সম্রাট হবার ডাক দেওয়া হয়েছিল, তিনি কিছুতেই রাজি হননি। নিজের ক্ষুদ্র দ্বারকাতেই খুশি ছিলেন। ভীমকে দিয়ে জরাসন্ধকে বধ করালেন তারপর জরাসন্ধের কারাগারে বন্দি রাজাদের মুক্ত করলেন। আর রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন কাকে? জরাসন্ধর ছেলেকে। সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রাজত্ব দখল করলেন না। নিজের ভাই বলরামকে নিয়ে কংসকে বধ করলেন কিন্তু রাজত্ব দখল করলেন না বরং উগ্রসেনকে রাজা বানিয়ে চলে গেলেন। গোপীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক কটু কথা শুনতে হয় কিন্তু এটাই সত্য যে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে গোপীদের ছেড়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় চলে যাবেন আর কখনোই ফিরে আসবেন না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গোটা গীতা জুড়ে একটার পর একটা যোগ, সাধনা সম্বন্ধে বলে গেছেন। প্রত্যেকটা সম্বন্ধে বলা শেষ করার পর অর্জুনকে বলছেন এবার তোমার যা করা উচিত, যেটা তোমার পছন্দ সেটা তুমি করো। কোনো কিছু চাপিয়ে দিচ্ছেন না অর্জুনকে। উৎসাহ দিচ্ছেন নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে।

আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করুন, মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কেন? কৃষ্ণ নিজেই বলছেন তিনি আসছেন ধার্মিক মানুষকে রক্ষা করতে। মানুষ নিজের পাপের বশে কষ্ট পাচ্ছে, গ্রহের ফেরে বা ভাগ্যের জন্য কষ্ট পাচ্ছে বলে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন না, মহাশক্তিধর পুরুষ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। মানুষকে বাঁচাতে এটাই আদর্শ। যথার্থ মানুষ কখনো স্বার্থপর হতে পারে না, কাপুরুষ হতে পারে না, অনাচার দুর করাই তার জীবনের ব্রত হতে পারে।

আরও কতগুলো ধারণাকে তিনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন। তিনি মাঠে নেমে কাজ করছেন, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। আর বলছেন যে আমার অপ্রাপ্য কোনও বস্তু নেই তবু আমি কাজ করি মানুষের কল্যাণের জন্য। আর যদি এভাবে কাজে নিযুক্ত না থাকি তাহলে মানুষ অলস হয়ে যাবে। নিজে প্রচণ্ড কর্মতৎপর অথচ তীব্র অনাসক্তি। সব ভোগ্যবস্তুর মধ্যে থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখার এক অদ্ভুত ক্ষমতাই তাঁর জীবন।

এই লোক কল্যাণের তত্ত্বটিকে সমাজে উপস্থাপিত করলেন যজ্ঞের মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বর্ণনা দিয়ে বলছেন, যে নিজের জন্য রান্না করে, সে পাপান্ন ভোগ করে। মানুষ শুধু নিজের জন্য বাঁচবে না। তাকে অন্যের জন্যও ভাবতে হবে। নিজের জন্য খেলে হবে না, অন্যের খাবার কথাও ভাবতে হবে। আরও একটি ধারণাকে নিয়ে এলেন সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার কথা। কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। বলছেন, তোমরা দেবতার আরাধনা করো, কারণ দেবতারা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, শস্য উৎপাদনে সাহায্য করবেন। তুমি, সমাজ, পরিবেশ, দেবতা সবই একসূত্রে গাঁথা।

আরও একটি বড়ো নতুন কথা বললেন, নিজের ভাগ্যকে দোষ দেওয়া নয়, নিজেই নিজেকে উদ্ধার করো। নিজেই নিজের বন্ধু হও। মানুষ প্রতিকূল অবস্থায় কী করে? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, না হলে জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আগে নিজে আত্মবিশ্বাসী হও, নিজেই নিজেকে উদ্ধার করো বিপদ থেকে। রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা নয়, বিপদকে মোকাবিলা করো, যুদ্ধে অবতীর্ণ হও এবং জয়লাভ করো।

এবার আজকের সমাজের দিকে তাকান। একজন মানুষের হাজারো অজুহাত— এটা হলো না, কারণ ওটা হলো না, সরকারের জন্যে হলো না, বিরোধী দলের জন্য হলো না, সংরক্ষণ ছিল না, পেছনে কেউ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, একে-তাকে দায়ী করে দায়িত্ব এড়িয়ে যেও না। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ঝাঁপ দাও আর পরিবেশকে পালটাও আর আত্মবিশ্বাসী হও।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ঘটনাগুলির দিক লক্ষ্য করুন। অত্যাচারী কংসের কারাগারে তাঁর জন্ম। বন্দিদশায় বাবা বসুদেব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সঙ্গে রয়েছে সদ্যোজাত পুত্র। তার জীবন সংশয়, বাসুদেব কী করলেন? ভয় পেলেন না, ভেঙেও পড়লেন না। এমন একটি সংকট থেকে রক্ষা করতে হবে সদ্যোজাতকে। তার জন্য প্রয়োজনে অবিলম্বে তাকে স্থানান্তর করতেই হবে। এই তীব্র ইচ্ছাশক্তিতেই তিনি পথ খুঁজে পেলেন। রক্ষীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ভুলে গেছে তালা লাগাতে। পথ চলা শুরু হলো বসুদেবের। এগিয়ে চললেন। আর তাকেই সাহায্য করতে এগিয়ে এল প্রকৃতি। পথ দেখাতে দেখাতে চললেন যোগমায়া। ছাতা ধরলেন বাসুকি। প্রতিকূল পরিবেশ, প্রতিপক্ষ শক্তিশালী তো কী হয়েছে? উদ্ধারের পথে নামো, নামলেই রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে— এটাই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মূল শিক্ষা ও বাণী। □

ড. রাধাকৃষ্ণন সংবিধান কমিটির একমাত্র অরাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন। সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানেও উপাসনা পদ্ধতি সংক্রান্ত ভারতীয় দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আলোচনার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তিনি।

শিক্ষাপদ্ধতিতে ড. রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের প্রয়োগের মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে শিক্ষক দিবস

পিন্টু সান্যাল

আজ এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে ড. রাধাকৃষ্ণনের ছবি নেই। ভারতবর্ষে আমরা ১৯৬২ সাল থেকে প্রতি বছর 'শিক্ষক দিবস' পালনের জন্য ভারতরত্ন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটিকে বেছে নিয়েছি তিনি শিক্ষা জগতে এক উজ্জ্বল নাম। একাধারে দর্শনের অধ্যাপক, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক এবং ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। এইরকম একজন মনীষীর জন্মদিন পালন করার জন্য আর অন্য কোনো কারণের প্রয়োজন নেই। শিক্ষা জগতে ভারতবর্ষে অনেক বড়ো বড়ো শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক জন্ম নিয়েছেন তাহলে শুধুমাত্র সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটিকেই শিক্ষক দিবস হিসেবে পালনের কী গুরুত্ব? যে ব্যক্তি সারাজীবন ধরে সারা বিশ্বের দর্শনের ইতিহাস, সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে অজস্র প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র, বই সমগ্র বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন তিনি নিজের আত্মজীবনী লিখলেন না। তাঁর ছাত্ররা তাঁর জন্মদিন পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে নিজের জন্মদিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাব রাখলেন।

রাধাকৃষ্ণনের এহেন ইচ্ছার কী কারণ থাকতে পারে? যিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজের বেতনের বেশিরভাগই প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দিয়ে দিতেন, যিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগেই সারা বিশ্বে সুপরিচিত দার্শনিক ও অধ্যাপক, তাঁর আর নিজেকে নতুন করে ভারতীয় মননে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল তাঁর দর্শনকে বা বলা ভালো ভারতীয় দর্শনকে শিক্ষাজগতে প্রতিবছর স্মরণ করানোর। কারণ, রাধাকৃষ্ণনের কর্মজীবন ভারতীয় দর্শনকে বিশ্বের শিক্ষাজগতে এবং দার্শনিকদের মাঝে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতেই ব্যয়িত হয়েছিল। এক সময় স্বামী বিবেকানন্দের দৃপ্ত ভাষণে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে ভারতবর্ষের যে দর্শন বিশ্বমঞ্চে ধ্বনিত হয়েছিল তার প্রতিধ্বনি শিক্ষাজগতে শোনা গেল রাধাকৃষ্ণনের লেখনীর মাধ্যমে। পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, ভারতীয় জীবনপদ্ধতি নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলেন দার্শনিকদের সভায় তাঁর প্রত্যুত্তর দিলেন ড. রাধাকৃষ্ণন। ভারতীয় দর্শনকে পশ্চিমের শিক্ষাজগতে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে প্রয়োজন ছিল ভারতীয় শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতের জ্ঞান আর ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা। আর সেই সঙ্গে ভারতীয় জীবনপদ্ধতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা— এই সবই তাঁর ছিল। তাঁর পরিবারে ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়নের পরম্পরা ছিল।

দর্শনের ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণনের কাজ ছিল প্রধানত মানবজীবনের

লক্ষ্য, সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে 'ভারতীয় দর্শন'কে তুলে ধরা। শিক্ষক দিবস হিসেবে নিজের জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে মানুষ গড়ার কারিগররা প্রতিবছর তাঁর উপলব্ধিগুলো তুলে ধরবেন— এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তিনি চেয়েছিলেন 'Teachers should be the best minds in the country' আর 'best mind' কীভাবে হওয়া যাবে তার বার্তাটি তাঁর দর্শনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

ড: রাধাকৃষ্ণণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমরা বিভিন্ন দেশে উপাসনা পদ্ধতির (Religion) নামে বর্বরতা প্রত্যক্ষ করছি। স্বামী বিবেকানন্দের মতো রাধাকৃষ্ণন বারবার একই দিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে বেদান্তের ঐক্যবোধের ভাবনা থেকেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বকে তিনি যে তাঁর বিশ্বশান্তির উপায় দিয়ে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টার জন্য তাঁর নাম ১১ বার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'Those who are acquainted with the religious history of Europe do not understand the striking phenomenon of China and India, that sectarian differences do not have the same significance there as they have in the West. If one is a devotee of Vishnu, it would not occur to him to look upon his neighbour who worships Siva as a heretic, doomed to everlasting perdition. These divinities represent different aspects of the Supereme. Chinese travellers of the early centuris of the Christian era give us accounts of crowds of Indian devotees of different sects meeting together and discussing ultimate problems or of universities run by teachers of different religious persuasions.' (East & west-A reflection)

ইউরোপ ও আরবের মতো ভারতীয় দর্শন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই দুইভাগে মানবজাতিকে ভাগ করে না, উপাস্যের নামে নৃশংসতার উদাহরণ তাই ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেনি যতদিন না পশ্চিম বিশ্ব নিজের উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষের 'তত্ত্বমসি' ও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর দর্শনকে ব্যাখ্যা করে রাধাকৃষ্ণন পশ্চিমের উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে ভারতবর্ষের পার্থক্য বুঝিয়েছেন তাঁর 'Hindu veiw of life' বই-তে।

ড. রাধাকৃষ্ণন ছিলেন একজন মানবতাবাদী দার্শনিক। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষ অনন্ত শক্তির আধার, বিশ্ব চৈতন্যের অঙ্গ। মানুষের মধ্যে যত বিভিন্নতাই থাকুক না কেন আসলে তাদের লক্ষ্য এক এবং তা হলো সেই পরম সত্তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা।

শুধুমাত্র আর্থিক সমৃদ্ধি, পার্থিব সুখ মানুষের উদ্দেশ্য হতে পারে না। রাধাকৃষ্ণন বলেন, 'Man can not be satisfied with earthly possessions not even with knowledge which instructs, informs and even entertains. He has another destiny, the realisation of the spirit in him.'।

ড. রাধাকৃষ্ণন মানুষকে শুধুমাত্র এক বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে দেখতে চাননি। মার্কসবাদের তত্ত্বকে আক্রমণ করে তাঁর প্রশ্ন, মানুষকে শুধুমাত্র অর্থনীতি, রাজনীতি, জৈবিক পদ্ধতি দিয়ে বোঝা সম্ভব? না, মানুষের একটি আধ্যাত্মিক সত্তাও আছে যা তাকে অনৈতিক সাময়িক লাভকে উপেক্ষা করে শাশ্বত সত্যলাভের পথে এগিয়ে দেয়। মানুষকে কি শুধুমাত্র চাহিদা, জোগান আর শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়? রাধাকৃষ্ণন এই প্রশ্নগুলি দিয়ে কমিউনিজমের মূল নীতিগুলিকেই সমস্যার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণন নিজের একটি ভাষণে বলেন, 'Unless we develop spiritual sensitivity we can not be regarded as properly educated.' তিনি চেয়েছিলেন উপনিষদের আলোকে যে 'spiritual sensitivity' যে আধ্যাত্মিকতার জন্ম হবে তাই নিয়ে আসবে কর্তব্যবোধ, নৈতিকতা। 'The ethics of Vedanta' প্রবন্ধে তিনি বেদান্তের দর্শন প্রসঙ্গে পশ্চিম বিশ্বের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং ভারতবর্ষের পুনরুত্থানে বেদান্তের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন।

মানুষ যখন এক অসীম সত্তাকে অস্বীকার করে নিজেকে সবকিছুর নিয়ন্তা ভেবে বসে তখনই সমাজে যথেচ্ছাচার জন্ম নেয়, স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি হয়, এক রাষ্ট্রনায়ক সমস্ত পৃথিবীকে নিজের পদতলে নিয়ে আসতে চায়। তাঁর কথায়, 'In his attempt to grasp and control life, build up a culture without God, he rebels against God. Self-sufficiency is carried to extremes. Wars are a result of this apostasy, this exaltation of nature unmodified by grace. The dictators have put themselves in the place of God. They wish to abolish belief in God, for they can brook no rivals.' (Religion & Society)।

আশাবাদী রাধাকৃষ্ণন যুদ্ধের মৌলিক কারণ হিসেবে বলেছেন মানুষের প্রকৃত সত্তার উপলব্ধির ব্যর্থতা। বিশ্বে যখন কমিউনিজমের বাড়বাড়ন্ত, সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে একের পর এক দেশ নিজেকে কমিউনিজমের আদর্শে গড়ে তুলতে চাইছে; বামপন্থার সূর্য যখন মধ্য গগনে, তিনি সেই সময় কমিউনিজমের দর্শনকে সমালোচনায় বিদ্ধ করতে ছাড়েননি। মানব সভ্যতার বিকাশকে তিনি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেননি। মার্কসের তত্ত্বের মূলে আঘাত

করে বলেছেন— 'A culture is not a superstructure of the material means of production as the Marxists believe.' তাঁর বেশভূষা সবসময়ই আপন সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই প্রকট করেছে।

রাধাকৃষ্ণন 'Hindu view of life' বইতে বিশ্বকে ভারতবর্ষের চার পুরুষার্থ— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সম্পর্কে বলেন। অর্থ ও কামপূর্তি জীবনে প্রয়োজন কিন্তু তা কখনোই চরম লক্ষ্য নয়। ধর্মের পথে মানুষ অর্থ ও কামের পূর্তি করবে কিন্তু তার চরম লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তি— 'Under the concept of dharma, the Hindu brings the forms and activities which shape and sustain human life. We have diverse interests, various desires, conflicting needs, which grow and change in growing. To round them off into a whole is the purpose of dharma. The principle of dharma rouses us to a recognition of spiritual realities not by abstention from the world, but by bringing to its life, its business (artha) and its pleasures (kama), the contollng power of spitritual faith।

তাঁর বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও বইতে তিনি ধর্মাশ্রয়ী সমাজের কথাই বলেছেন। 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোসাইটি' বইয়ের একটি অংশে সেক্যুলারিজমের কুফল সম্পর্কে বলেছেন, 'সেক্যুলারিজম ইজ দ্য চিফ উইকনেস অব আওয়ার এজ'। প্রসঙ্গত তাঁর মৃত্যুর (১৭ এপ্রিল, ১৯৭৫) পর জরুরি অবস্থার সময় ভারতীয় সংবিধানে 'সেক্যুলারিজম' শব্দের সংযোজন হয়। নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি থাকলে তাঁকে দিয়ে ভারতাত্মায় এতো বড়ো আঘাত দেওয়া যেত না। বিভিন্ন রিলিজিয়ন (উপাসনা পদ্ধতি)-এর বিরোধের সমাধানসূত্র হিসেবে সনাতন ধর্মকেই চিহ্নিত করেছেন এই বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক— That the Hindu solution of the problem of the conflict of religions is likely to be accepted in the future seems to me to be fairly certain. —Hindu view of life।

ভারতবিরোধী ঐতিহাসিকদের আর্য আক্রমণ তত্ত্ব এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু ১৯৫৫ সালে যখন মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষকে সনাতন সংস্কৃতি থেকে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা চলছে, সেই সময়ে মহেঞ্জোদাড়ো থেকে পাওয়া সিল মোহরে যোগীমূর্তিকে, 'আদিযোগী' শিব হিসেবেই ব্যাখ্যা করে ৫০০০ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সনাতন সংস্কৃতির ঐতিহাসিকতাকে তুলে ধরেছেন রাধাকৃষ্ণন। তিনি নিজের সাহিত্যকীর্তির জন্য মোট ১৬ বার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে শুধুমাত্র দর্শনের শিক্ষার্থী ছাড়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা কি তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে? এ এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা নয় কী? যাকে আমরা 'জাতীয় শিক্ষক' বলে গ্রহণ করেছি তাঁর সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোনো উপায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নেই কেন?

ড. রাধাকৃষ্ণনের প্রথম বই ১৯১৯ সালে প্রকাশিত 'The Philosophy of Rabindranath Tagore'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন রচনাকে (গীতাঞ্জলি, সাধনা) সামনে রেখে তাঁর রচনার উপনিষদীয় ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করেন। এই বইতে বস্তুবাদের সমালোচনা এবং সমাজ ও বিভিন্ন দেশের সমস্যার সমাধান হিসেবে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে খুব ঘটা করেই 'শিক্ষক দিবস' পালিত হয় কিন্তু যে উপনিষদীয় দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণন সামনে আনতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা হয় না। বাঙ্গালি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করে বস্তুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত মার্কসীয় দর্শনকেই বামপন্থী শাসকের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ৩৪ বছর, যার কুফল এখনো ভুগছে বাঙ্গালি। ১৯৪৮ সালে ড. রাধাকৃষ্ণন ভগবদ্গীতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এর আগেও ইংরেজিতে গীতার অনুবাদ প্রচুর হয়েছে কিন্তু বিশ্বপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিসেবে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি গীতার দর্শনের সঙ্গে ইউরোপীয় দর্শনের তুলনা করে গীতাকে আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে শিক্ষাজগতে আলোচনায় নিয়ে আসেন। ১৯১১-তে তিনি তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র 'The ethics of the Bhagavadgita and Kant'-এ জার্মান দার্শনিক কান্টের দর্শন এবং ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য ও মিল সম্পর্কে আলোচনা করে 'ভগবদ্গীতা'র মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই গবেষণাপত্রটি আন্তর্জাতিক মহলে তাঁকে দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

যাকে আজ আমরা 'আদর্শ শিক্ষক' হিসেবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তিনি 'ভগবদ্গীতা'কে জীবনদর্শন হিসেবে তুলে ধরেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত নৈতিকতার বিকাশে 'গীতা'কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে আমরা পেরেছি কি? ১৯৫০ সালে 'রাধাকৃষ্ণন কমিশন' প্রস্তাব করে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কয়েক মিনিট ধ্যানের পর পঠনপাঠন শুরু করা হোক। রাধাকৃষ্ণন বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনাকে কলেজের পাঠক্রমের অংশ করার পক্ষপাতী ছিলেন যাতে ভারতীয়রা তাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। ড. রাধাকৃষ্ণন সংবিধান কমিটির একমাত্র অরাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন। সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানেও উপাসনা পদ্ধতি সংক্রান্ত ভারতীয় দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আলোচনার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তিনি। তাঁর সভাপতিত্বে University Education Commission-এর রিপোর্টে বলা হয় 'We do not accept a purely scientific materialism as the philosophy of the State. That would be to violate our nature, our svabhava, our characteristic genius, our svadharma. Though we have no State religion, we cannot forget that a deeply religious strain has run throughout our history like a golden thread'। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণন স্বদেশের 'স্বধর্ম' এবং কয়েক হাজার বছর ব্যাপী ভারতের ইতিহাসকে আধ্যাত্মিতার যে স্বর্ণসূত্রটি বেঁধে রেখেছে তাকে মনে রাখতে বলেছেন। তাই শুধু ড. রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা নয়, তাঁর দর্শনকে শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজে প্রয়োগ করতে পারলেই 'শিক্ষক দিবস' পালন সার্থক হবে। □

যাদবপুর র‍্যাগিং কাণ্ডে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মুখ খুলেছেন

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ সাধনে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। তবে ব্যক্তি জীবনে কোন মূল্যবোধ জাগ্রত করা দরকার তা দর্শনই নির্ধারণ করে দেয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। তবে মানব সভ্যতা আজকে এক বিরাট বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে চলছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার ছায়া নেমে এসেছে। মানুষের জীবনে প্রকৃত মূল্যবোধের অভাব দেখা দিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং কাণ্ডে ছাত্রের মৃত্যুতে মানুষের বিশেষ সম্পদ মনুষ্যত্ব যেন লোপ পেতে চলেছে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন--- 'বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনার করার জায়গা। সেটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। র‍্যাগিং বন্ধে কড়া আইন করা উচিত।' শ্রীলেখা মিত্র বলেছেন— 'এটা কোনও সাধারণ ইস্যু নয়, এটা পাওয়ার গেম। রাজনৈতিক দলগুলি এই মুহূর্তে তা ব্যবহার করছে। তবে তাঁর টার্গেট শুধুমাত্র একটা প্রতিষ্ঠান হতে পারে না।' দুই প্রখ্যাত ব্যক্তির এই দুটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য। অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র মানুষকে ঈশ্বর বা প্রকৃতির নিকৃষ্ট জীব বলে মন্তব্য করেছেন। তবে আমি মনে করি মানুষ জীব শ্রেষ্ঠ। তার বুদ্ধিমত্তা প্রখর। ঈশ্বর তার মস্তিষ্কে সর্বপ্রকার সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধিতে পূর্ণতা দান করছেন। তবে ভোগবাদীগণ তাদের উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা শুধু আপন স্বার্থে উন্মত্ত।

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা। মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনও উচিত নয়। মনই অবস্থাভেদে বদ্ধ জীবের বন্ধু ও শত্রু হতে পারে। আলোচ্য বিষয়ে ক্রীড়া ও সংগীত জগতের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব গণতন্ত্র ও সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে রাজ্যে র‍্যাগিং কাণ্ডে পাওয়ার গেমের বিরুদ্ধে মূক ও বধিরতা ত্যাগ করে মুখর হয়েছেন, আমি সাধুবাদ ও অভিনন্দন জানাই। আমি একজন প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে মনে করি বিদ্যালয়ের পথে ছাত্রী ধর্ষণ ও মৃত্যু এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে র‍্যাগিং কাণ্ডে ছাত্রের মৃত্যুর বিরুদ্ধে সমগ্র শিক্ষক সমাজ মুখর হবেন এটাই প্রত্যাশা

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা,
কোচবিহার।

সরকারি স্কুলের পঠনপাঠন

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোতে বিস্তর গলদ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা আনে চেতনা আর চেতনা আনে বিপ্লব। বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলা এখন শিক্ষা দুর্নীতিতে জর্জরিত। যাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখার ও পরিচালনা করার দায়িত্ব তারাই এখন জেলবন্দি। তাই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা নজরদারির অভাবে সরকারি স্কুলের পঠন পাঠন কী হচ্ছে না হচ্ছে কেউ দেখার নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময় মতো স্কুলগুলি হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা রুটিন মাফিক ক্লাস করছেন না। একটা শিক্ষাবর্ষে প্রায় ছ'মাস বিভিন্ন অজুহাতে সরকার স্কুল বন্ধ রাখে। সিলেবাস শেষ করার কোনো সুযোগ নেই। সরকারি স্কুল এখন কেবল পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়েছে। আর বেসরকারি স্কুল, কোচিং সেন্টার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ সরকারি স্কুলের পঠন- পাঠনের এমন অবস্থা যে ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত অর্থব্যয় করে টিউশন পড়তে হচ্ছে। জনগণের করের টাকায় শিক্ষকদের কোটি কোটি টাকা বেতন দেওয়ার পরও তারা সরকারি স্কুলের শিক্ষক পঠন পাঠন সঠিকভাবে করাচ্ছেন না। এমনকী ম্যানেজিং কমিটিগুলির সরকারি স্কুলের উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আগে এই কমিটিগুলি সরকারি স্কুলগুলিকে ভালোভাবে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ করতো। এখন শুধু প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগসাজশে মিড ডে মিলের টাকা বা স্কুল উন্নয়নের টাকা ভাগাভাগি করা ছাড়া আর কোনো কাজ করতে দেখা যায় না। তাই বর্তমানে বেসরকারি স্কুল, কোচিং সেন্টারের বাড়বাড়ন্ত। শহরাঞ্চলে অধিকাংশ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা একেবারে তলানিতে। ভবিষ্যতে সরকারি স্কুলের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ থাকবে না। এমনিতেই ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইলের আসক্তি আর পরীক্ষার সময় অবাধে টোকাটুকির সুযোগ করে দেওয়ার ফলে তারা পঠনপাঠনে তেমন মনোযোগী নয়। তারপর পাশ ফেল নেই, ফলে পঠনপাঠনের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। সরকারি স্কুলের পঠনপাঠনের বাৎসরিক পর্বভিত্তিক বিভাজন রয়েছে সেটাও বাস্তবসম্মত নয়। কারণ প্রথম পর্বে, দ্বিতীয় পর্বে সময় বেশি, সিলেবাস কম আর তৃতীয় পর্বে সময় কম সিলেবাস বেশি। তার মধ্যে নানা উৎসব অনুষ্ঠান রয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অল্পসময়ের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা প্রস্তুতি সেভাবে হয় না। স্কুলগুলিতে সিলেবাস অনুযায়ী পঠনপাঠন শেষ করাও হয় না। অথচ পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধে টোকাটুকির সুযোগ করে দেওয়া হয়। একজন সরকারি স্কুলের শিক্ষক নিজের ছেলে বা মেয়েকে বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করান। কারণ তিনি সরকারি স্কুলের পঠনপাঠনের হালচাল ভালোভাবে জানেন। সাধারণ গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষের ছেলে-মেয়েদের বিনামূল্যে লোখাপড়ার একমাত্র মাধ্যম সরকারি স্কুল। তাই এই সরকারি স্কুলের পঠনপাঠনের হালচাল ভালো হোক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেবাস অনুযায়ী পঠন-পাঠন করানো হোক।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনারোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজের হালহকিকত

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ হিন্দু ধরলে সংখ্যায় সেটা প্রায় সাত কোটি। কবি লিখেছিলেন 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী রেখেছো বাঙ্গালি করে মানুষ করোনি'। এই সাত কোটির মধ্যে বজরংবলি, জগন্নাথ ভক্ত বা ছটপুজোয় অংশ নেওয়া বাঙ্গালিদের সংখ্যা এক কোটি ধরলে বাকি যে ছ'কোটি থাকে। পরিবার পিছু পাঁচজন সভ্য সংখ্যা ধরলে পরিবার সংখ্যা ১.২ কোটির বেশি নয়। অর্থাৎ এই পশ্চিমবঙ্গে ১.২ কোটি হিন্দু বাঙ্গালি পরিবার বাস করে। তাদের মধ্যে অর্ধেক পরিবারে যদি একজন স্কুল গোয়িং চাইল্ড আছে ধরা যায় তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৬০ লক্ষ। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও এই রাজ্যে সব শিশুকে স্কুলমুখো করা যায়নি। যদি ধরে নিই সব হিন্দু পরিবারই তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়েছে তাহলে দেখা যাচ্ছে করোনা-উত্তরকালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে মাত্র ছয় লক্ষ (২০২১-এর তুলনায় চার লক্ষ কম)।

সুতরাং বলা যায় ৬০ লক্ষ বিদ্যাথী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে মাত্র দশ শতাংশ। মাধ্যমিকে বসা এই সংখ্যাটা ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ও উর্দু মাধ্যম যোগ করে। হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজি মাধ্যম যদি বাদ দিই তাহলে এই ১.২ কোটি বাংলা মাধ্যম হিন্দু পরিবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সহজেই অনুমেয়। পর্ষদের হিসেব মতো প্রতি বছর গড়ে ৮০ শতাংশ সফল হয়। বলা দরকার এর মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণদেরও ধরা হয়। এই ৪.৮ লক্ষ সফল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে চার লক্ষ উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষায় বসলে (যেটা মোটেই বাস্তব নয়) এবং তার ৮০ শতাংশ উত্তীর্ণ হলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় তিন লক্ষ কুড়ি হাজার। সকলেই কলেজে ভর্তি হচ্ছে এমন আর একটি অবাস্তব অনুমান করলেও কলেজগুলোতে মোট ছাত্র সংখ্যা তিন লক্ষের বেশি কোনো মতেই হওয়ার কথা নয়। ২০২০ সালের, (সম্ভবত করোনা-পূর্ব সময়ে) পরিসংখ্যান বলছে এই রাজ্যে স্নাতক স্তরের ছাত্রসংখ্যাটা ১৬ লক্ষ। সম্ভবত এটা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের মিলিত সংখ্যা। বলা দরকার এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, পলিটেকনিক ও অন্যান্য professional course-এর ছাত্ররা এবং অন্য রাজ্য থেকে এবং নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ থেকে আসা ছাত্ররাও আছে।

এই ভাবে হিসেব করলে অনুমান করা যায় এই রাজ্যের কলেজগুলোতে সামনের বছরে মোট ছাত্র সংখ্যা কতো হতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাত কোটি হিন্দু বাঙ্গালির মধ্যে বর্তমানে কলেজ পড়ুয়ার সংখ্যা ০.০৫ শতাংশেরও কম। এখানে বলে রাখা ভালো, এর সবটাই অনুমান। বাংলা দূরদর্শনে প্রতিদিনের সান্ধ্য আসরে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সুবক্তা ছাত্রনেতাদের দেখে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, যেগুলো পাঠকদের কাছে পেশ করতে চাই।

(১) যে রাজ্যে ০.০৫ শতাংশ বাঙ্গালি ছাত্র কলেজে যায় সেখানে বছর বছর বক্তা নেতার জোগান এত হয় কী করে? (২) এদের বাচনভঙ্গি শুনে মনে হয় না এরা ইংরেজি মাধ্যম থেকে এসেছে। (৩) এদের বেশিরভাগই সাহিত্য, অর্থনীতি কিংবা আইনের ছাত্র। এমনকী যে যাদবপুর বা কলকাতা এই ধরনের নেতাদের breeding ground সেখানকার কোনো মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়রিঙের ছাত্রকে এদের মধ্যে দেখা যায় না বললেই হয়। (৪) দেখে মনে হয় এরা সকলেই উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা, অর্থাৎ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অভিভাবকদের সন্তান এরা নয়। (৫) ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় বিশ্বনাথ মুখার্জি থেকে পল্টু-গুরুদাস দাশগুপ্ত হয়ে মহম্মদ সেলিমের যুগে প্রিয়রঞ্জন ছাড়া অ-বাম দলগুলিতে তেমন সফল বক্তা ছাত্রনেতার দেখা মেলেনি। কিন্তু বর্তমানে তিন প্রধান দলেই দক্ষ খেলোয়াড় মজুত।

যেটা বলার তা হলো জঙ্গি আন্দোলনের যুগে যত সহজে ছাত্র নেতা থেকে বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী হওয়া যেত এখন তেমনটা হয় না, কারণ জনপ্রতিনিধিত্বের টিকিট বিলির সময় টলিউডি নট-নটিরা সব দলেই বাড়তি গুরুত্ব পায়। সর্বোপরি, যে সময়ে কলেজে কলেজে নির্বাচনী উন্মাদনা অতীত সেখানে এত সংখ্যায় ছাত্রনেতা তৈরিই-বা হয় কোথায়? প্রথম যখন বারো বছর বয়সে দাদারা আমাকে দু' ধরনের ব্যাগ আর একটা টাকা দিয়ে বাজার করতে পাঠিয়েছিল, আট আনার মাছ, দু' আনার আলু, দু' আনার পটোল, এক আনার লেবু লঙ্কা আর দু' আনায় মায়ের জন্য পান-দোক্তা কিনে ছ' নয়া পয়সা অর্থাৎ এক আনা ফেরত এনে যারপরনাই বাহবা পেয়েছিলাম।

ষাট-সত্তরের ক্রান্তিকালে বাজারু কুণালের বাজার-সঙ্গীদের মধ্যে নামকরা চেনা লোকেরা ছিলেন গৌরদা (গৌরকিশোর ঘোষ যিনি বাজারের সামনের ইউবিআইয়ের উপর তলায় থাকতেন), প্রতিবেশী সাহিত্যিক ও কলকাতা পুরসভার কর্মী সন্দীপনদা, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, দেবদাস পাঠক, শিল্পী প্রকাশ কর্মকার, অমানুষে উত্তমকুমারের কাছে মার খাওয়া শম্ভু ভট্টাচার্য, কখনো কখনো চিন্ময় রায়, অভিনেতা অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়, কবি ভাস্কর চক্রবর্তী ও নির্মলদা, যাঁর মৃত্যুর পর কাশীপুর-বরানগর গণ হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। তারপর এই বরানগর বাজার তার ভদ্রাসন ছাড়িয়ে একদিকে সিঁথির মোড় আর অন্যদিকে গঙ্গাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। আজ এক হাজার টাকা নিয়ে আগের মতোই ছোটো বড়ো দু'রকম ব্যাগ নিয়ে বাজারে গিয়ে প্রায় সব কিছুই ক্যারি ব্যাগে পেলাম।

দুটো বিষয় খুব চোখে পড়ছে। (১) যত বেশি বরানগর পৌরসভা ক্যারি ব্যাগ বিরোধী প্রচার বাড়াচ্ছে তত বেশি তার ব্যবহার বাড়ছে। (২) যত বেশি ড. গর্গ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ভদ্রলোক গুটখাখোর বলে হিন্দিভাষীদের বিরুদ্ধে অসূয়া জনিত এক ধরনের বিক্ষোভের তেজ বাড়াচ্ছে, ততই বরানগর বাজারে অবাঙ্গালি দোকানদারদের সংখ্যা ও বাঙ্গালিদের মধ্যে হিন্দি বলার প্রবণতা বাড়ছে। এমবিবিএস ও হার্ভার্ড ফেরত বলে দাবি করা এবং 'বাংলাকে' রক্ষার দাবিদার এই স্বঘোষিত মেসাইয়াটি আইএসআইয়ের এক-ফ্যাকাল্টি সর্বস্ব Psychometric Research and Service Unit-এর Assistant Professor। তিনি কালেভদ্রে অফিসে আসেন, biometric attendance-এর ব্যবস্থা না থাকার সুযোগ নেন এবং লক্ষাধিক টাকা বেতন পান।

কুণাল চট্টোপাধ্যায়, বরাহনগর, কলকাতা।

মাতৃপ্রতিম মা

শুভশ্রী দাস

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দানের পরম্পরা অতি প্রাচীন। সমাজে যে কোনো দানকেই উচ্চ দৃষ্টিতে দেখা হয়। ইদানীং আরও একটি দান শুরু হয়েছে। সন্তানদান। এই দাতারা হচ্ছেন মাতৃপ্রতিম মা। ইংরেজিতে 'সারোগেট মাদার' বলা হয়। এর অর্থ হলো কোনো দম্পতির ভ্রূণকে যিনি নিজের গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রসবের পর সন্তান সেই দম্পতিকে সমর্পণ করেন।

এই প্রক্রিয়া যদি এখানেই সীমিত থাকতো তবে এর থেকে শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু হতো না। কিন্তু যেখানে লেন-দেন ও টাকাপয়সার কথা আসে সেখানে দান না হয়ে ব্যবসা করা হয়ে যায়। আজ সারোগেসি রূপে সমাজে এর ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। সারোগেট মাদাররা অর্থের বিনিময়ে গর্ভ ভাড়া দিচ্ছেন।

স্বামী-স্ত্রীর প্রাকৃতিক সম্পর্কের ফলে উৎপন্ন সন্তানের সামাজিক মান্যতা থাকে। কিন্তু কিছু ত্রুটির জন্য কোনো কোনো দম্পতি সন্তানবিহীন থাকেন। অতি আধুনিকতার নামে কোনো কোনো মহিলা (রূপ নষ্ট হওয়ার ভয়ে) সন্তান ধারণ করতে চান না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির কারণে আজকাল অনেক এরকম পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে যা স্বামী-স্ত্রীর ত্রুটি দূর করে তাদের সন্তানসুখ দিতে পারে। আবার একেবারেই সন্তান না হলে অনাথশিশু দত্তক নেওয়া যেতে পারে। দেশে অনেক অনাথ আশ্রম আছে, সেখান থেকে আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো শিশুকে দত্তক নিয়ে তার বাবা-মা হওয়া যেতে পারে।

এসবের থেকে আলাদা একটি পদ্ধতি সারোগেসি। সন্তানেচ্ছু দম্পতির শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পরীক্ষাগারে নিষিক্ত করে তা সারোগেট মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়। সারোগেট মা ন'মাস পর্যন্ত এই ভ্রূণ নিজের গর্ভে ধারণ করে সন্তান জন্মের পর ভ্রূণের মালিক দম্পতিকে দিয়ে দিতে হবে। এটাই সারোগেসির সাধারণ প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন উঠতে পারে সারোগেসি কেন? এর কারণ হলো আজও নিজের অংশ থেকে উৎপন্ন সন্তানের আনন্দ ও মর্যাদাই আলাদা। অনাথ শিশু দত্তক নেওয়ার চেয়ে সারোগেসি থেকে উৎপন্ন সন্তান একেবারে আপনার মনে হয়। কারণ এতে মা-বাবা দুজনেরই সমান অংশ থাকে। সারোগেসির এই ভাবাত্মক দিকটি শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশেও সমানভাবে আদৃত। একথাও প্রমাণিত যে, সারোগেসি পদ্ধতিতে সন্তান নেওয়ার জন্য ভারতে আসছেন অধিকাধিক বিদেশি দম্পতি।

এর ভাবাত্মক দিকটি উপেক্ষা করে এখন টাকাপয়সা দিকটা বড়ো করে দেখা হচ্ছে। আইন ব্যবস্থা কি একে ব্যবসার সংজ্ঞা দিয়েছে? প্রথমে জানা প্রয়োজন সারোগেসি বৈধ মান্যতা পেয়েছে। এক কথায় এটি নিঃসন্তান দম্পতি ও সারেগেট মাদারের মধ্যে এটা একটা আইনি চুক্তি। টাকাপয়সার বিষয়ে চুক্তিতে স্পষ্ট বিবরণ দিতে হয়। এখন সারোগেট মাদারকে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা দিতে হয়। অপ্রিয় সত্য হলো, এই ব্যবসায় বছরে প্রায় ৮৫ কোটি ডলার লেন-দেন হচ্ছে। ২০২০ সালে ১০০ কোটি ডলারে পৌঁছে গেছে। বিদেশী দম্পতিদের এজন্য ভারতে আসার কারণ ভারতে সারোগেট মাদারকে দিতে হয় প্রায় ছ' লক্ষ টাকা। আমেরিকাতে এর খরচ ৩৫ লক্ষ অর্থাৎ ছয়গুণ কম খরচে ভারতে সন্তান পাওয়া যায়।

এখন সারোগেট মাদার অর্থাৎ গর্ভ ভাড়া দেওয়ার জন্য প্রধানত গরিব মায়েরাই এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এদের শোষণ করাও কম হচ্ছে না। নিঃসন্তান দম্পতি বিদেশি হলে শিশুর অধিকার নিয়েও ঝামেলা হয়। ২০০৮ সালে গুজরাটের আনন্দ শহরে সারেগেসি পদ্ধতিতে এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছিল। শিশুটি এক জাপানি দম্পতির ছিল। জন্মের আগেই জাপানি দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় শিশুটির কাস্টডির মামলা কোর্টে আটকে যায়। ফলে ওই সারোগেট মাদার মুশকিলে পড়ে যান। এসব চিন্তা করেই সারোগট মায়েদের সুরক্ষার জন্য এক নতুন আইন তৈরি করা হচ্ছে :

- কোনো ফার্টিলিটি ক্লিনিকে চাকুরি করতে পারবেন না।
- তাঁকে সারোগেসি এজেন্সির মাধ্যমে আসতে হবে।
- কোনো সারোগেট মাদার এক দম্পতির জন্য তিন বারের বেশি ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করাবেন না।
- শুধুমাত্র ভারতীয় দম্পতির জন্য গর্ভ ভাড়া দেওয়া যাবে।
- সন্তানের ওপর সারোগেট মায়ের কোনো অধিকার থাকবে না।
- সন্তান তার পিতা-মাতার পরিচয়ই পাবে।

গুজরাটের আনন্দ শহর সারোগেসির কেন্দ্ররূপে এখন সামনে এসে গেছে। এখানে কেবল হাসপাতাল ও ফার্টিলিটি সেন্টারে মাসে গড়ে ৩০টি শিশুর জন্ম হয়। ৫০০ সারোগেট মাদার নাম নথিভুক্ত করেছেন।

ভারতীয় সমাজে কোনো মায়ের গর্ভধারণ থেকে শিশুর জন্ম পর্যন্ত অনেকগুলি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সারোগেসি পদ্ধতি জন্ম হওয়া শিশু কি ওই সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আসে?

শাস্ত্রে বলে, প্রাকৃতিক সম্পর্কের ফলস্বরূপ গর্ভধারণ, মায়ের স্নেহাঞ্চল, বাৎসল্যপূর্ণ দুধ এবং বাবার আদরই শিশুকে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। ভাড়া করা গর্ভের সন্তান কি এসব পায়? পয়সার বিনিময়ে পাওয়া সন্তান মূল্যবোধ সম্পন্ন হয় কি? ■

তালের গুণাগুণ

কানু রঞ্জন দেবনাথ

তালশাঁস ও পাকা তাল দুই-ই খাওয়া যায়। তাছাড়া পাকা তালের আঁটি মাটিতে ফেলে রাখার পর যখন ওর অঙ্কুর বের হয়, তখন ওই আঁটিটিকে কেটে আঁটির মাঝখানের সাদা অংশটিও খাওয়া যায়। আজকালকার ছেলে-মেয়েয়েদের ভাগ্যে এসব কবে আবার জুটবে তা জানি না। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে তালশাঁস এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পাকা তাল খাওয়া হয়।

কচি তালের উপকারিতা : তালশাঁস অনেকটা জেলির মতো নরম এবং বরফের মতো স্বচ্ছ। খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি মিষ্টি। তালশাঁসের মধ্যে থাকে ভিটামিন এ.বি.সি, কপার, জিংক, আয়রন, ফাইবার, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি- ইনফ্ল্যামেটরি।

তালশাঁসের উপকারিতা :

১. জলশূন্যতা দূর করে, প্রচণ্ড গরমে বা রৌদ্রে বা অন্যান্য কারণে দেহে জলশূন্যতা দেখা দিলে বা জলের পিপাসা দেখা দিলে তাল শাঁস খেলে জলের পিপাসা মিটে এবং দেহে জলশূন্যতা দূর হয়। দেহের ক্লান্তিভাবও দূর হয়। ২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আমাদের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। তাল শাঁসের মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে থাকে। ৩. মুখের রুচি বৃদ্ধি করে থাকে। তাছাড়া বমি বমি ভাব দূর হয়। ৪. লিভার সুস্থ ও ভালো থাকে। কারণ এতে লিভার ভালো রাখার প্রয়োজনীয় উপাদান বর্তমান। ৫. রক্তশূন্যতা দূর করে। তাল শাঁসে প্রচুর আয়রন আছে। তাই যেসব ব্যক্তি অ্যামিনিয়া বা রক্তশূন্যতায় ভুগছেন তারা যেন তালের শাঁস খান। ৬. চোখের জন্য উপকারী। তালের শাঁসের মধ্যে আছে পর্যাপ্ত ভিটামিন-এ। রাতকানা রোগ থাকলে তা দূর হয়ে থাকে। এছাড়া চোখের দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। ৭. হাড় মজবুত হয়। তালের শাঁসে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম। বয়সের ফলে হাড়ের ক্ষয় ও দুর্বল হলে তালের শাঁসে উপকার পাবে। ৮. তালের শাঁসে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকায় দাঁতকে শক্ত ও মজবুত রাখতে সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া দাঁতের ক্ষয়রোধ করে। ৯. তালের শাঁসে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উপাদান আছে। যাদের স্মৃতিশক্তি কম তারা তাল খান, উপকার পাবেন। ১০. হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। তালের শাঁসে আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। এই ফাইবার পেটের খাবারকে হজম করতে সাহায্যে থাকে। অ্যাসিডিটি থেকে অনেকটা মুক্তি পাওয়া যায়।

পাকা তালের উপকারিতা : প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা তালে আছে ৮৭ কিলোগ্রাম ক্যালরি, জলীয় অংশ ৭৭.৫ গ্রাম, ফ্যাট-০.১ গ্রাম, আমিষ ০.৮ গ্রাম, শর্করা ১০.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৫ মিলিগ্রাম, আয়রন ১ মিলিগ্রাম। এই পাকা তাল খেলে নিম্নলিখিত উপকার পাওয়া যাবে।

১. পুরানো কাশি দূর করে। অনেকদিন ধরে যাদের কাশি কমছে না তারা যদি চার চামচ পাকা তালের রসের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে কয়েকদিন খায় তাহলে পুরানো কাশি থেকে মুক্তি পাবে। ২. যাদের বুক ধড়ফড় করে, ঘুম কম হয় তারা তাল খেলে উপকার পাবেই। ৩. পাকা তালের মধ্যে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ফলে যারা পরিমাণ মতো তাল খাবে তাদের কাছ থেকে ক্যানসার অনেকটা দূরে থাকবে। ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী ফ্রি রেডিক্যালকে নষ্ট করে তাল। ৪. পাকা তালের মধ্যে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস। এগুলি আমাদের দাঁত ও হাড়কে সবল ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে থাকে। ৫. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে পারে। পাকা তালের মধ্যে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার। এই ফাইবার আমাদের দেহের মধ্যে যাওয়া খাবারকে হজমে সাহায্য করে। পায়খানা বা মল নরম হয়। ফলে পায়খানা পরিষ্কার হয়। কোলন ক্যানসারের ভয়ও কমে। ৬. পাকা তালের মধ্যে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার। এই ফাইবার আমাদের দেহের মধ্যে যাওয়া খাবারকে হজমে অনেক সাহায্য করে। ৭. অল্প পরিমাণে পাকা তাল খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। ৮. যাদের শরীরে ব্যথা-বেদনা আছে তারা তাল খেলে অবশ্যই উপকার পাবেন।

তালের অপকারিতা : তাল অতিরিক্ত খেলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন : যেসব ব্যক্তি ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের তালের পিঠে বেশি না খাওয়ায় ভালো। যারা কোলেস্টরেলের সমস্যায় ভুগছেন, তাদেরও না খাওয়া ভালো। যেসব ব্যক্তি হাইব্লাড প্রেশারে ভুগছেন সেসব ব্যক্তি যদি ডিমের কুসুম ও দুধের সঙ্গে তালের কোনো জিনিস খায় তাহলে তাদের ক্ষতি হবে। কাচা তাল খাওয়ার পরে যদি কেউ সঙ্গে সঙ্গে জল খায় তাহলে পেটব্যথা হতে পারে। তাল খেলে বারবার পায়খানা, গ্যাস, অম্বল হতে পারে। তালে যাদের অ্যালার্জি থাকে, তাদের তাল না খাওয়াই ভালো। □

শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক

ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একজন নিবিড় রাজনীতিবিদ। তিনি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করে প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু হিন্দু আদর্শের প্রকৃত নেতা না থাকার জন্য সেই উদ্যোগ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর সীতারাম উপন্যাসে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু আদর্শ রাজার অভাবে সেই রাজ্য আর হিন্দুরাজ্য থাকেনি। স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু যোগ্য নেতৃত্ব বা কর্ণধার না পাওয়ার জন্য তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। কাজেই হিন্দু রাষ্ট্রগঠন এবং পরিচালনার জন্য দেশের সামনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জাতীয় আদর্শের একটি মডেল তুলে ধরতে চাইলেন। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর জাতীয় আদর্শ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং রাজা হওয়ার উপযুক্ত হয়েও নিজে রাজা হননি, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই কৃষ্ণ প্রথম ভারতবর্ষে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুর জাতীয় আদর্শ। মনে রাখতে হবে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে তিনি জাতীয় আদর্শ নন; হিন্দুর জাতীয় আদর্শ বলেই তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে শ্রীকৃষ্ণ দেশস্থিত কোনো জাতির ধ্বংস বা বহিষ্কারের পথ গ্রহণ করেননি; নীতিহীন অধার্মিক জাতির বিনাশে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই জাতীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত থেকে আবিষ্কার করেছিলেন।

বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস— শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সেকথা বিশ্বাস করতেন; কিন্তু এখানে সেই সাধারণ বিশ্বাসের প্রচলিত ধারা থেকে সরে আসেন তিনি। কারণ, বঙ্গদেশের বিচিত্র বিশ্বাসে যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু, যাঁর মুখনিঃসৃত বাণী থেকে গীতার সৃষ্টি সেই শ্রীকৃষ্ণ— বাল্যে চোর, কৈশোরে পারদারিক এবং পরিণত বয়সে প্রবঞ্চক ও শঠ। কৃষ্ণনাম জপ করলে কৃষ্ণসাধনা করলে ধর্মের উন্নতি হয় অথচ কৃষ্ণের তেমন পাপাচরণ বড়ো বিস্ময়ের! প্রচলিত এই বিষয়টিকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই পুরাণ ইতিহাসে বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে যুক্তির নিরিখে যাচাই করে দেখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এক নিবিড় ঐতিহাসিক গবেষণায় নিমগ্ন হলেন। দেখলেন কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যেসব পাপোখ্যান জনসমাজে প্রচলিত তা সকলই অমূলক; এবং সেই অমূলক অংশ বাদ দিয়ে এক পরম পবিত্র আদর্শ চরিত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। তখনই তিনি—

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ— এই দুই কৃষ্ণের কথা জানতে পারলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একজন মনুষ্যচরিত্র এবং এক আদর্শ পুরুষ; তিনিই প্রথম অখণ্ড ভারতের রূপকার এবং ভারতীয় হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

১

বঙ্কিমচন্দ্র যে কৃষ্ণকে একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন সেই কৃষ্ণ একজন মানুষ এবং তিনি মহাভারতের চরিত্র। প্রাচীন ইতিহাস তথা ঐতিহাসিক মহাকাব্য মহাভারত পাণ্ডবদের ইতিহাস। মহাভারতের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এবং শ্রীকৃষ্ণ ইক্ষ্বাকুবংশের মানুষ। একটি নির্দিষ্ট দিনে মাটির পৃথিবীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আজও তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। তিনি পিতা বসুদেব এবং মাতা দেবকীর সন্তান। ঈশ্বরের অবতার হয়েও এই কৃষ্ণ একজন মানুষ। নির্গুণ ভগবান ধর্মসংরক্ষণ এবং দুরাত্মাদের বিনষ্ট করার জন্য অবতার রূপে আবির্ভূত হন। ঈশ্বর যখন অবতাররূপে নরলোকে অবতীর্ণ হন তখন তিনি সম্পূর্ণ মানুষ ভাবেই প্রকাশ হয়ে থাকেন, কোনো প্রকার অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে দেবতা বলে প্রচার করেন না। মানুষের আত্মিক উন্নতিবিধানে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে কৃষ্ণের কৃতিত্ব এক স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্র মানব শ্রীকৃষ্ণের কথাই তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু ধর্মার্থ ভিন্ন তিনি নিজে যুদ্ধ করেননি, অন্যদেরও তেমন যুদ্ধে প্রেরণা দেননি। তবে অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মরক্ষা তথা আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, প্রজারক্ষার্থে যুদ্ধকে তিনি ধর্মযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে কংস বধ, জরাসন্ধ বধ, কালযবন বধ তাঁর তেমন ঘটনার উদাহরণ। যে কোনো ধর্মে পাপ নিবারণের জন্য সংকল্পিত কাজের নাম ধর্মপ্রচার। উপদেশ দান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ দ্বিবিধভাবেই ধর্মপ্রচার সম্ভব। সব দিক থেকেই শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুর আদর্শ চরিত্র। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য ধর্মের আদর্শ চরিত্রের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে দেখিয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সব ধর্মের আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। জাতির কল্যাণে ধর্মপ্রচার প্রসঙ্গে মানব অবতারের ভূমিকা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— 'খ্রিস্ট, শাক্যসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ' অর্থাৎ উপদেশ দান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ উভয় অনুষ্ঠানই করেছিলেন। তার মধ্যে শাক্যসিংহ এবং খ্রিস্টকৃত ধর্মপ্রচার উপদেশ দানে সম্ভব হয় কিন্তু কৃষ্ণকৃত ধর্মপ্রচার 'কার্যপ্রধান'। কৃষ্ণের ধর্মপ্রচার একজন আদর্শ পুরুষের আদর্শ জীবননির্বাহের আনুষঙ্গিক বিষয়। যিশু বা শাক্যসিংহ 'কার্য্যপ্রধান'। কৃষ্ণের ধর্মপ্রচার একজন আদর্শ পুরুষের আদর্শ জীবননির্বাহের আনুষঙ্গিক বিষয়। যিশু বা শাক্যসিংহ মনুষ্যশ্রেষ্ঠ আর কৃষ্ণ একজন আদর্শ পুরুষ। বরেণ্য রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়রা হিন্দুজাতির আদর্শপ্রতিমার নিকটবর্তী কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন—

'যিশুকে যদি রোমক সম্রাট ইহুদার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না— কেননা, রাজকার্যের জন্য যেসকল বৃত্তি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভুরি ভুরি বর্ধিত হইয়াছেন, যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোনো গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন— জরাসন্ধের বন্দিদের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ : যদি ইহুদিরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। 'কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য— কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ওইরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, ধর্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদের, রাজাদের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। সেই সময় আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-পরিজন পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে অর্জুন অবসাদগ্রস্ত হৃদয়ে জানতে চেয়েছিলেন— যুদ্ধ করে কী হবে? জয়লাভ করেই-বা কী হবে? রাষ্ট্রসংকটের এক চরম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অর্জুনের এমন প্রশ্নের অর্থ— জীবনের মানে কী তা জানতে চাওয়া, আর তারই ভিত্তিতে সংকটকে উপেক্ষা করা। যুদ্ধে সারথি শ্রীকৃষ্ণ সেদিন অর্জুনকে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে কর্তব্যকর্মে উদ্যোগী করে তুলেছিলেন। হাজার হাজার বছর আগে অর্জুনের এমন জীবনমুখী প্রশ্ন এবং একই সঙ্গে উপযুক্ত উপদেশ দানে অর্জুনকে সক্রিয় করে তুলতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা কালান্তরে সময়ের প্রেক্ষাপটে আজও প্রাসঙ্গিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অর্জুনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও সেই একই প্রশ্ন জেগেছিল— 'এ জীবন লইয়া কী করিব?'

একাধারে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।'

এই কৃষ্ণচরিত্র হিন্দুজাতির আদর্শ। এমন আদর্শ অনুসরণ প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল, যেদিন থেকে তার অবনতি, সেদিন থেকে হিন্দুসমাজেরও অবনতি শুরু হয়েছে। একালে দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের জন্য সেই আদর্শকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করতে হবে।

২

হিন্দুর আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ একটি অখণ্ড ধর্মরাষ্ট্র গঠন করতে নীতিহীন অধার্মিক রাজাদের বিনাশ করেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে সেই উদ্দেশ্য সফল করেন। এর আগে বলা হয়েছে যে, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হয়। অতুলনীয় রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সমস্ত সভ্যতায় যুদ্ধ এক অনিবার্য অধ্যায়; যুদ্ধ রাষ্ট্রনীতির ফল। সেকালেও বিশাল ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক ভোগবাদী কলহে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মহাভারতীয় সেই আভ্যন্তরিক প্রেক্ষাপটের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

'এক্ষণে দস্যুজাতি বিজিত, পদানত, দেশপ্রান্তবাসী শূদ্র; ভারতবর্ষ আর্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্যগণ বাহ্যশত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে তারা কে ভোগ করিবে। এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে।'

সেই সময় ভারতবর্ষের তেমন আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন :

'এরূপ সমাজে দুই প্রকার মনুষ্য সংসারচিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান— এক, সমরবিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতি বিশারদ মন্ত্রী। এক, মল্টকে, দ্বিতীয় বিসমার্ক; এক গ্যারিবলদি, দ্বিতীয় কাবুর। মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে— এক অর্জুন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ— সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য্য।'

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধরেননি; সবকিছুই করেছেন মানসিক বলের দ্বারা।

বর্তমান ভারতবর্ষে তেমন কোনো শ্রীকৃষ্ণের অনিবার্যতার কথা পাঠক ভাববেন। এখন আমাদের কৌতূহল, বঙ্কিমচন্দ্রকৃত ভারতবর্ষের এই চিত্র কি কেবলমাত্র মহাভারতীয় সময়কালের রাষ্ট্রচিত্র? সেদিনের সেই ভোগবাদী ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক চিত্রের সঙ্গে বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক চিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায় না কি? দৃশ্যমান নানান অভিজ্ঞতার আলোকে মনে হয়, বর্তমানে নানান প্রদেশজুড়ে সমগ্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সেই একই দৃশ্য আজও অব্যাহত। মহাভারতের সময় থেকে হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, আমরা সভ্যতায় প্রযুক্তিতে ক্রমাগত প্রগতিশীল, তবু মহাভারতীয় সেই ভোগবাদী সমস্যার সমাধান হয়নি। আর ভোগবাদের কারণেই বর্তমান ভারতবর্ষেও নিত্য জটিলতার প্রকাশ ও বিস্তার, গঠনের বেদীতে দাঁড়িয়েও ধ্বংসাত্মক নৃত্যলীলা নিত্য প্রকাশ হয়।

আমাদের জানা আছে যে, কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব গীতা গ্রন্থে সংকলিত আছে। গীতায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মবাদের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উপনীত হওয়ার কথাগুলি বলা হয়েছে। মনে রাখতে হয়, কর্মবাদের কথা কৃষ্ণের আগে প্রচলিত ছিল এবং সেখানে বলা হয়েছে— বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম। গীতায় সেই কর্মযোগের কথা পরিবর্তিত হয়ে কথিত হয়েছে যে— স্বধর্মপালনই প্রকৃত কর্ম। যে যেমন কর্তব্যে রত তার তেমন কর্মই তার স্বধর্ম। কৃষ্ণকথিত এই কর্মযোগে সেকালে প্রবল কাম্যকর্মপরায়ণ বৈদিক ধর্মের নিন্দা; তাই বলে তিনি ব্রাহ্মণদের কখনও অসম্মান করতেন না। কারণ ব্রাহ্মণেরা— বিদ্বান, জ্ঞানবান ও ধর্মাত্মা; তাঁরা সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত থাকতেন। একালেও পদবি নয়, যাঁরাই বিদ্বান, জ্ঞানবান ও ধর্মাত্মা তাঁরাই ব্রাহ্মণ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সেই ভোগবাদী রাষ্ট্রে রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা আজও অবিস্মরণীয়। নীতিহীন অধার্মিক রাজাদের ধ্বংস করে তিনি সেদিন এক অখণ্ড ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপনা করেন। সেই অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের তিনিই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় :

'কেবল পাণ্ডবগণকে একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে খণ্ডে এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই; শান্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর বিরোধী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্তব্য, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর ভারমোচন।'

বর্তমান ভারতবর্ষে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলতে জনগণমন অধিনায়ককে কৃষ্ণস্বরূপ হওয়া দরকার।

পুনরুক্তি যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু ধর্মার্থ ভিন্ন তিনি নিজে কখনও যুদ্ধ করেননি অন্যদেরও তেমন যুদ্ধে প্রেরণা দেননি। তবে অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মরক্ষা তথা আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা,

প্রজারক্ষর্থে যুদ্ধকে তিনি ধর্মযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে কংস বধ, জরাসন্ধ বধ, কালযবন বধ তাঁর তেমন ঘটনার উদাহরণ। কিন্তু সমাজে অপরাধী আছে; ধর্মহীন এবং ভোগবাদী মানুষেরা লোভে-হিংসায় সব সময়ই পরস্পরের প্রতি অপরাধ করে চলে। সমাজ কল্যাণে সেই অপরাধের দমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বঙ্কিমের ভাষায় 'রাজনীতি, রাজদণ্ড, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই'। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হয়ে রাষ্ট্রীয় শত্রু দমনে রাষ্ট্রগঠনের কাজটি করেছিলেন। মনে হয়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটি রচনাকালে পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য গঠনের চিন্তা যেমন করেছিলেন, তেমনি পরাধীন ভারতের নাগরিক হয়েও স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বরূপটি আগাম দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থে পৌরাণিক বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার বিষয়টিও আমাদের স্মরণে রাখতে হয়। সমাজের সেই ভোগবাদী প্রেক্ষাপটে তিনি রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত করে সমস্যার সমাধান করেন কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের এই রাষ্ট্রচিন্তার আদর্শকে একবারও স্মরণ করেছে কি না— সেই প্রশ্ন আজ উঠতে পারে এবং তা অমূলক নয়। মনে বর্তমান ভারতবর্ষে বিচিত্র বিষয়ে ক্রমাগত অসন্তোষ ভারতের জাতীয় সংহতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে কৃষ্ণস্বরূপ কোনো এক আদর্শ নেতার অভাব তার মূল কারণ। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজা নেই কিন্তু রাজধর্ম আছে। রাজার সিংহাসনে বসে আছেন মন্ত্রীরা, কিন্তু তাঁদের অনেকের রাজধর্ম কতখানি আদর্শ সমন্বিত তা দেশের জনসমাজ দেখছে। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাষ্ট্র স্থাপনা করে যুধিষ্ঠিরকে রাজা করেন। যুধিষ্ঠির একজন ধর্মাত্মা রাজা; কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হলে রাষ্ট্র ধর্মচ্যুত হবে। এমন চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মানুমতের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করতে নীতিজ্ঞ ভীষ্মকে নিযুক্ত করেছিলেন। আজও যুগোপযোগী সেই ধর্মানুমত, সেই নীতিজ্ঞতা, সেই ভীষ্মের দরকার। হয়তো-বা সবই আছে কিন্তু সে সব সংশয়ের সিংহাসন অলংকৃত করে আছে।

৩

এর আগে একাধিকবার একথা বলা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই হিন্দুরাষ্ট্র কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য নয়; সেই রাষ্ট্র সকল ভারতবাসীর জন্য। হিন্দু বলতে সমগ্র ভারতবাসীকেই বুঝতে হয় কিন্তু হিন্দুর সেই অখণ্ড আদর্শের কথা কি জনসমাজে তুলে ধরা হয়! হিন্দুর জাতীয় আদর্শবাহী ভিন্ন এমন মহান কাজের দায়িত্ব কে পালন করবেন! সিংহাসনের লালসায় যিনি বা যাঁরা দিনে রাতে রং বদলের ভূমিকা গ্রহণ করেন— তিনি সিংহাসন বোঝেন, মানুষ বা অখণ্ডতার কথা বোঝেন না। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দেশের ঐতিহ্য বিষয়ে অধ্যয়ন ও অনুশীলন আজ একান্ত অনিবার্য। এমন না হলে দেশের প্রকৃত আদর্শ দেশের সামনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। হিন্দুর জাতীয় আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ সেকালে হিন্দুধর্ম এবং রাজধর্মের প্রচার করেছিলেন— যা আজও আমাদের স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ চরিত্রের বিশেষত্ব বর্ণনায় বলেছেন, 'তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণ) জীবনের কাজ দুইটি—ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন এবং ধর্ম্মপ্রচার'। কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের কথা বলা হয়েছে; এখন তাঁর ধর্মপ্রচারের কথা বলতে হয়।

মনে রাখতে হবে, হিন্দুধর্ম খ্রিস্টান বা ইসলামের মতো একটা রিলিজিয়ান নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় হিন্দুধর্ম The Substance of Culture। হিন্দুধর্ম পালনের জন্য মন্দিরে যাওয়া বাধ্যতা নয়; মন্দিরে না গিয়েও হিন্দুধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা যায়। হিন্দুধর্ম আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবনের প্রাণশক্তি। হাজার হাজার বছর ধরে বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-সমন্বিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা আমরা শুনে আসছি এবং সেই ব্যাখ্যা থেকেই হিন্দুধর্মের আদর্শ এবং আমাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। গীতা আমাদের বহু প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতার সময় থেকে বর্তমানের সময় কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, যুগে যুগে ব্যাখ্যা এবং অতি ব্যাখ্যার ফলে অর্থ অনেক সময় অনর্থে পরিণত হয়েছে, তবু তার আসল অস্তিত্বটুকু আজও অমলিন ও ভাস্বর। স্মৃতি সংহিতা শাস্ত্রগুলির মতো গীতা নিত্য-আচরণের শাস্ত্রবিধানমূলক গ্রন্থ নয় কিন্তু আমাদের জীবন গঠনে রাষ্ট্রধর্ম পালনে গীতোক্ত-ধর্ম আজও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নিবিড় ও গভীর মানবিক হয়ে ওঠে— যদি আমরা তা অনুশীলন করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথাগুলিই তাঁর কৃষ্ণকর্তৃক প্রচারিত ধর্মের মধ্যে বলতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় একটা ব্যাপক জীবনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর গীতা ব্যাখ্যায় মনুষ্যত্ববোধে উন্নীত হওয়ার পদ্ধতিগত একটা আদর্শ আছে। সেই বোধ এবং সেই পদ্ধতি থেকে আমরা জানতে পারি কোনটি আমাদের করণীয় কর্তব্য, কোনটি নয়। গীতায় কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপাকথনে ধর্ম ও অধর্মের তত্ত্ব যেমন বিবৃত হয়েছে; তেমনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে জীবনের আসল অস্তিত্ব এবং চিরন্তন সত্য নির্ধারণের মূল কথাগুলি। গীতা যেন মনুষ্যত্ব বিকাশের এক বিস্ময়কর মহাবিজ্ঞান। জাতীয় চরিত্র গঠনের আকর গ্রন্থ এই গীতা ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থ বলেই মনে করি।

সাম্প্রতিক সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আজ আমাদের ব্যক্তিজীবনেও কি সেই একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না? এই প্রশ্ন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সমস্যা-সংকটের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি

সত্য হয়ে ওঠে ভোগাকাঙ্ক্ষার চরম পরিণামেও। যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরেও সেই একই উত্তর— ঈশ্বরানুবর্তিতা তথা ভক্তি ছাড়া মনুষ্যত্ব নেই। মনুষ্যত্ব অর্জন হয়। গীতার আদর্শ মনুষ্যত্বের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন— ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধনা করতেই বলেছেন। সংসারবিমুখতা বা চরম ভোগাকাঙ্ক্ষা নয়— সংসারে থেকে জ্ঞান ও কর্মপথে সামাজিক কল্যাণসাধনার নাম মনুষ্যত্বের সাধনা। গীতার উদ্দেশ্য যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে পূর্ণ মানবধর্মের পরিচয় তুলে ধরা। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিজীবনে— 'এ জীবন লইয়া কী করবি? লইয়া কী করিতে হয়? —এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন— 'সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই'। এখানে তিনি ভক্তির কথা বললেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিকে গ্রহণ করতে পারেননি। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বলেছেন— ভগবদ্‌গীতা সকল ভক্তিতত্ত্বের মূল। 'এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা আছে সেও গীতামূলক। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। অনুশীলন ধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটু বিরোধ আছে'। আমরা দেখেছি— পূর্ণ মনুষ্যত্বের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বৃত্তিগুলিকে— শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারভাগে ভাগ করেছেন। বলেছেন মানবজীবনের বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশেই পূর্ণ মনুষ্যত্বে উপনীত হওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকৃত অনুশীলনধর্মের সূত্র অনুসারে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি পূর্ণ নয়। আনন্দমঠ উপন্যাসে মহেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন— 'চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে— উহা অর্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়— সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়'। চৈতন্যদেব এবং আনন্দমঠের সন্তানদল উভয়েই বৈষ্ণব কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।

আনন্দমঠ ও সীতারাম দুটি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনধর্মের অনুশীলন ও প্রয়োগ ঠিক হয়নি বলেই সেখানে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিপর্যয় এসেছে— সমাজ ধ্বংস হয়েছে। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে প্রফুল্ল অনুশীলনধর্ম অনুশীলনে সার্থক কিন্তু সে নারী। তাই তার প্রতিষ্ঠা পরিবার গঠনে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের শেষ পরিণতি— কৃষ্ণভক্তি। সেই কৃষ্ণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ; মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ দেখাতে গীতা তাঁর অনন্য শাস্ত্র। বর্তমানে চরম ভোগাকাঙ্ক্ষার জীবন ও জগতে কেবলমাত্র রামকৃষ্ণময় বা চৈতন্যময় অমেয় কথায় চরিত্রভূমি সিক্ত হতে পারে কিন্তু নির্মাণশিল্পের আধার পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। অথচ চরম বাস্তবের নিদারুণ বিশৃঙ্খল গণতান্ত্রিকতায় শাসক ও জনগণের মানসমুক্তির আধারে সেই নির্মাণশিল্প আজ অনিবার্য। জানি তা সময়সাপেক্ষ, তবু বাধ্যতামূলক অনুশীলনধর্মের অনুশীলন ভিন্ন সেই নির্মাণতার সম্ভাবনায় সুনিশ্চিত সংশয় থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণকে বাস্তব অপেক্ষা বিস্ময়ের মহাসৃষ্টি বলে মনে হতে পারে কিন্তু মহাভারত যেমন মহাসত্য, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনধর্ম জীবনগঠনের এক অন্যতম অভিনব বাস্তবতা। বিশ্বাস রাখি, মনুষ্যত্ব গঠনের এই অনুশীলনধর্ম একদিন ভারতবর্ষকে জাতিগঠনের এক নতুন দিশা দেখাবে। ■

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় মানব শ্রীকৃষ্ণ একজন আদর্শ পুরুষ

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় এই মানব শ্রীকৃষ্ণ একজন আদর্শ পুরুষ। ঈশ্বর মানবদেহ গ্রহণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাই তাঁর জীবনাচরণে কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিগ্রহ। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সামগ্রিক প্রকাশ ও পরিণতির সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতার নাম পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং এইটাই মানবধর্ম। ধর্ম অনুশীলন সাপেক্ষ এবং অনুশীলন কর্মসাপেক্ষ। কর্মের পূর্ণতা তথা স্বধর্ম পালনে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্বে পরিণত হয়। মানবধর্ম তথা 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর তত্ত্বগুলির বাস্তব উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, 'অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ত্ব মাত্র, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপনীত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ'। অনুশীলনধর্মের শারীরিকবৃত্তিতে কৃষ্ণ-তেজ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রগুণে তিনি ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠ। অনুশীলনে বাল্যবয়স থেকেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ। অভিমন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর এমনকী কোনো সময় স্বয়ং অর্জুনেরও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য। মানসিকবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ। মানবসমাজে তাঁর মতো বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির উদাহরণ পাওয়া যায় না। তাঁর অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ— গীতা। গীতা শ্রীকৃষ্ণের ধর্মমতের সংকলন। এইভাবেই পরাক্রম ও পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমায় সব দিক থেকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই তিনি আদর্শ পুরুষ।

তিনি তাঁর এই মানব শক্তির বলেই নির্ধারিত সব কাজ করেছিলেন এবং দুরাত্মাসম অনেক অধার্মিক রাজাকে বধ করে ভারতবর্ষে অখণ্ড ধর্মরাষ্ট্র স্থাপনা করেছিলেন।

দ্বারহাট্টা ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরে গণিত বিজ্ঞান মেলা

প্রাচীন ভারতের গৌরবময় পরম্পরা গণিত বিজ্ঞান চিন্তনের প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যে গত ১৯ আগস্ট হুগলী জেলার দ্বারহাট্টার ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরে হুগলী জেলা গণিত বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়।

মেলায় জেলার ৭টি শিশুমন্দির থেকে ৮৩ জন ভাই-বোন অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞানের প্রসারের প্রয়াস নিয়ে আয়োজিত এই মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল গুরুদয়াল ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন শিশুমন্দিরের অভিভাবক তথা স্কুল পরিদর্শক অভীক পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আশুতোষ দে, হুগলী জেলা বিদ্যাভারতীর পর্যবেক্ষক বাবলু মণ্ডল। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা গণিত বিজ্ঞান মেলার আহ্বায়ক তথা ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য কৌশিক দুলে।

তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের উদ্যোগে অমৃত মহোৎসব অনুষ্ঠান

গত ১৯ আগস্ট সিউড়ীতে 'তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ' স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে বীরভূম সাহিত্য পরিষদ শতবার্ষিকী সভাকক্ষে সাহিত্যধারার এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। সুব্রত নন্দন ও তপন দে সরকারের যৌথকণ্ঠে পরিবেশিত জাতীয় স্তোস্ত্রের পর সভার উদ্বোধন করেন সংস্থার সভাপতি বিপিন মুখোপাধ্যায়। বিষয় ছিল— **স্বাধীনতার ৭৫ বছর এবং তারাশঙ্কর**। সংস্থার সম্পাদক এবং আলোচনাচক্রের আহ্বায়ক ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপনে কেন্দ্র সরকার যে যে সূত্র স্মরণ ও পালনের নির্দেশ দিয়েছে, অমৃত আহরণের সাগ্নিক সন্ন্যাসী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যে সেইসব উপাদান বহু পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আলোচনাসভার প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ কওসর জামাল। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সহসভাপতি ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। মুখ্য অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়িতা ভার্মা ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। সুব্রত নন্দন ও তপন দে সরকারের যৌথকণ্ঠে জাতীয় সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে কল্যাণী মাঝের চরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে কল্যাণী মাঝের চরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে সাধুসন্তরাও সম্মিলিত হন। আম, কাঁঠাল, সবেদা, কলা ইত্যাদি ৫০ রকমের উন্নত জাতের ফলের গাছ রোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সর্বানন্দ অবধূত মহারাজ, পরাশর মহারাজ, কার্তিকানন্দ মহারাজ, অনুজলক্ষ্মণ

মহারাজ, প্রব্রাজিকা আত্মকামপ্রাণা ও শঙ্কর মহারাজ। দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের পক্ষে ছিলেন মিলন খামারিয়া, অরিত্র ঘোষ দস্তিদার, অধ্যাপক দিলীপ কুমার মিশ্র, শুভেন্দু মণ্ডল ও বিপ্লব সরকার।

ওইদিন স্থানীয় মানুষদেরও চারাগাছ বিতরণ করা হয়। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চারাগাছ দিয়ে সহযোগিতা করে।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ২০ আগস্ট সিউড়ী অরবিন্দপল্লী নিবাসী ষষ্ঠীকিঙ্কর সরকারকে শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন সন্ন্যাসী স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীসরকারকে মাল্যদানে ভূষিত করেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। পা ধুইয়ে পূজা করেন বড়ো বউমা শ্রীমতী চৈতালি সরকার। নামাবলী, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। মানপত্র পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত ডাক বিভাগের আধিকারিক আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায় ও অনুরাধা সরকার। পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর শান্তিমন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবসে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

চুড়কা মুর্মু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী চকরাম প্রসাদ গ্রামের চকরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ১৮ আগস্ট একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিলোক মহন্ত এবং আরোগ্য ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি অমিয় মাহাত। বালুরঘাট থেকে দুজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে শিবিরে মোট ৬৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়।

এদিন সকালে একাত্তরের যুদ্ধে প্রাণ বলিদানীকারী স্বয়ংসেবক চুড়কা মুর্মুর সমাধিস্থলে এবং তাঁর স্মৃতিস্মারক বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মন এবং অন্যান্য কার্যকর্তা ও গ্রামবাসী। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট নগরের স্বংসেবক তথা বালুরঘাট লোকসভা সদস্য সুকান্ত মজুমদার।

With Best
Compliments from -

A
Well Wisher

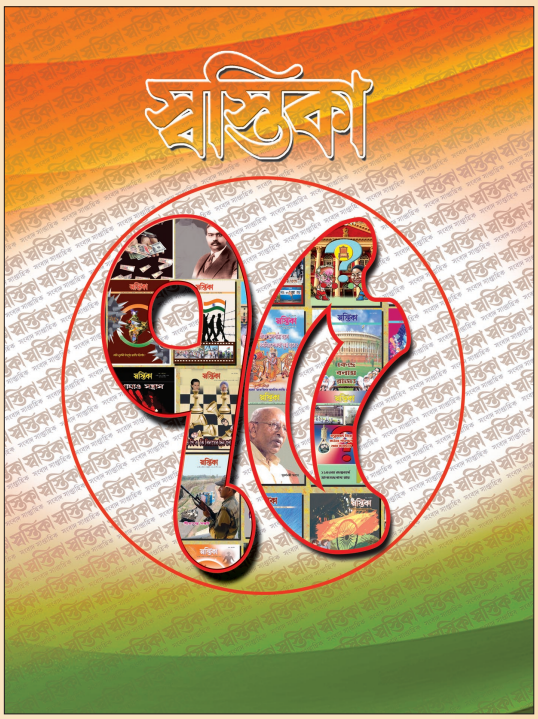

স্বস্তিকার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ।

এটি আগামী ৩ অক্টোবর '২৩ পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবতের করকমল দ্বারা বেলুড় মঠের প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।
প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১
শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭
শ্রী জয়রাম মণ্ডল — ৮৬৯৭৭৩৫২১৪/২১৫

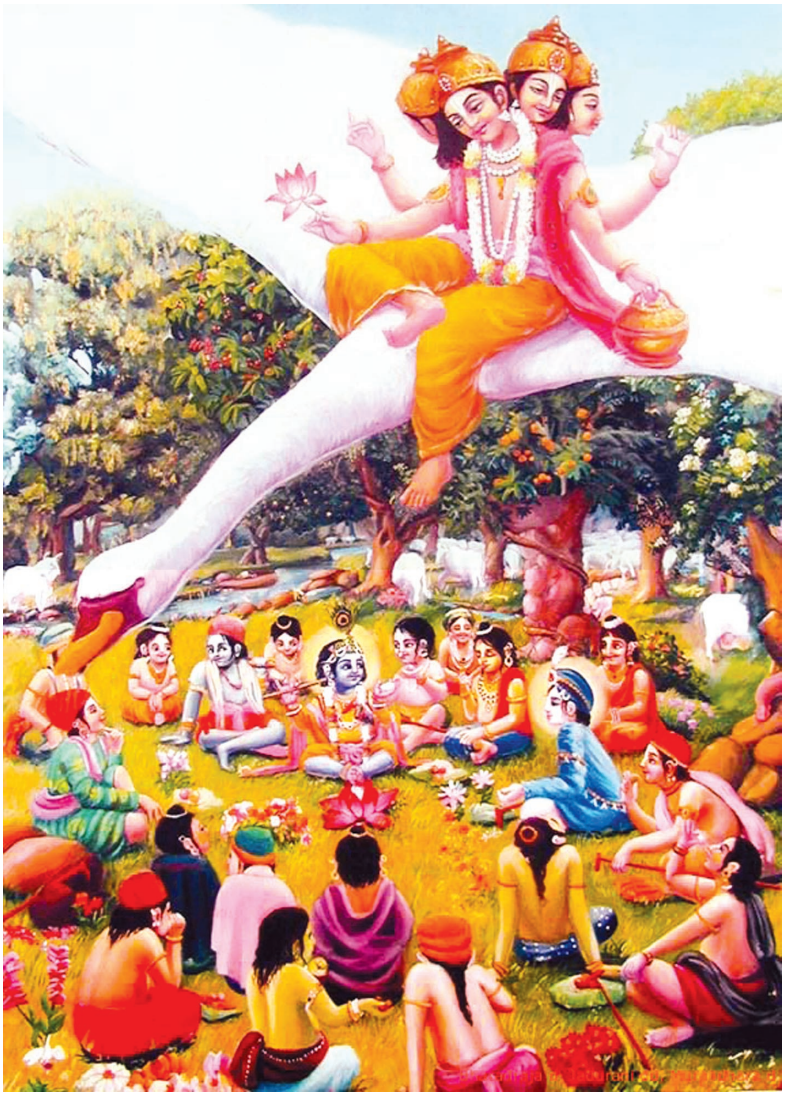

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা : ব্রহ্মার কৃষ্ণলীলা দর্শন

গোপাল চক্রবর্তী

বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ একে একে পুতনা, বকাসুর, অঘাসুরের মতো দুরাত্মা রাক্ষসদের বধ করে চলেছেন, এছাড়া তার অন্যান্য অলৌকিক বাল্যলীলায় দেবতারা বিস্মিত। বিস্ময়কর অঘাসুর বধলীলা দর্শন করে প্রজাপতি ব্রহ্মা অভিভূত। তিনি বাল্যলীলায় রত কৃষ্ণভগবানের আরও মহিমা প্রত্যক্ষ করার জন্য কিঞ্চিৎ ছলনার আশ্রয় নিলেন।

মৃত্যুরূপী অঘাসুরের মুখগহ্বর থেকে সখা গোপবালকগণ আর তাদের ধেনু রক্ষা করে এনে এক স্নিগ্ধ সরোবরের তীরে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। বাস্তবিক এই পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। এখানকার বালি অত্যন্ত কোমল ও নির্মল। সরোবরে ফুটে আছে অজস্র পদ্ম। তার সুগন্ধে এসেছে ভ্রমর আর পাখির দল। তাদের গুঞ্জন আর কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত। এই মনোরম স্থানে সঙ্গে আনা আহার্য দ্রব্য দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সারবার প্রস্তাব করলেন শ্রীকৃষ্ণ। সখাগণ এক কথায় রাজি। ধেনু বৎসগুলিকে জল পান করিয়ে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে চরতে দিয়ে তারা মহানন্দে ভোজন করতে লাগল। ব্রজবালকেরা ভগবানের চারদিকে পদ্মফুলের দলের মতো অসংখ্য পঙ্‌ক্তি রচনা করে শ্রীকৃষ্ণের সামনা-সামনি বসল। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমণি, সকলের মুখ তার দিকে, তাই বিকশিত পদ্মের মতো তাদের আকৃতি হলো। সকল যজ্ঞের ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপবালকদের সঙ্গে বসে ভোজন করলেন। তার কারণ তিনি নিজেই তাঁদের সঙ্গে লীলা করছেন। তাঁর কটিবন্ধে বেণু, বাম বগলে শিঙ্গা, বাম হাতে ধেনু তাড়নের পাচন। ডান হাতে দইমাখা ভাত গ্রাস করে খাচ্ছিলেন। তিনি পদ্মের মাঝখানে বীজকোষের মতো উপবিষ্ট হয়ে প্রিয় সখাদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করছিলেন। হরিদ্বেষীরা বাদে সমগ্র ত্রিভুবন এই আশ্চর্য ভোজন লীলা উপভোগ করছিল।

কৃষ্ণসখা গোপবালকেরা যখন শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত হয়ে আনন্দে ভোজনরত, তখন তাঁদের গাভীগুলি বৎসদের সঙ্গে চরতে চরতে আরও গভীর বনে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে তাদের আর না দেখে ব্রজ বালকেরা উদ্বিগ্ন হলো। তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাদের অভয় দিয়ে স্বয়ং সেই ধেনু বৎসদের সন্ধানে গেলেন। অরণ্য, পর্বত, গুহা, নিবিড় তৃণভূমি তন্নতন্ন করে সন্ধান করেও কোথাও সেই ধেনু ও বৎসদের দেখতে পেলেন না। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সখা গোপবালকদের কাছে ফিরে এলেন। কিন্তু যেখানে তারা ভোজনরত ছিল

সেখানে কাউকে তিনি দেখতে পেলেন না। তখন তিনি ধেনু বৎস এবং সখাদের সন্ধান করতে লাগলেন বনের চারপাশে। যখন বনের সর্বত্র খোঁজ করেও ধেনু কিংবা গোপবালকদের দেখতে পেলেন না তখন হঠাৎ তাঁর মনে হলো এ নিশ্চয় ব্রহ্মার কাজ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, তাঁর পক্ষে একথা জানা আশ্চর্য নয়। আগে ব্রহ্মা আকাশ থেকে শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর সংহার দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি এখন বাল্যলীলায় রত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দেখার জন্য ব্রজবালকদের ভোজনের অবসরে তাদের ধেনু ও বৎসগুলি অপহরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ধেনুর সন্ধানে প্রস্থান করলে ব্রহ্মা কৃষ্ণসখা গোপবালকদেরও অপহরণ করেন।

বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপবালকদের জননীদের এবং ব্রহ্মার আনন্দবর্ধনের নিমিত্ত নিজেকে ধেনুবৎস ও গোপবালক এই দুইরকম প্রকাশ করলেন। তিনি চিন্তা করলেন যদি তিনি ধেনু আর গোপবালকদের ফিরিয়ে আনেন তবে ব্রহ্মার আনন্দ নষ্ট হবে। আর যদি তিনি গোপবালকদের মূর্তি না ধরেন তাহলে তাদের জননীদের দুঃখের সীমা থাকবে না। কাজেই উভয়ের প্রীতির জন্য তিনি নিজেই দুই রূপে অসংখ্য হয়ে উঠলেন। গোপবালকদের যে রকম ছোটো শরীর, ছোটো হাত-পা, একই রকম বেণু, শিঙ্গা, শিখা প্রভৃতি, যেমন বসন ভূষণ, শীল-গুণ, আকার, বয়স, বিহার অবিকল সেই রকম হয়ে ভগবান বিরাজ করতে লাগলেন। 'সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়' এই আপ্ত বাক্যটি তখন প্রত্যক্ষ হলো। ভগবান এরকম সর্বাত্মা হয়ে সদলে ব্রজে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজেই গোবৎসরূপ ধরে বিচরণ করছেন, আবার পালক হয়ে তাদের চালনা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়াবলে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি ব্রজ বালকের রূপ ধারণ করেছিলেন। এবার তাদের মায়া ধেনু ও বৎস-সহ আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের গৃহে প্রবেশ করল। ব্রজের মায়েরাও ভগবান কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়েছিলেন, তাই তাঁরা বংশীধ্বনি শুনে নিজ নিজ পুত্রের গৃহে ফেরার সময় হয়েছে জেনে এগিয়ে গেলেন। তারপর সেইসব মায়া-বালকদের নিজেদের পুত্র ভেবে পরমব্রহ্মকেই কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন এবং স্নেহবশত ক্ষরিত অমৃততুল্য স্তন্যপান করালেন।

আগেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাভী ও গোপরমণীদের বাৎসল্যভাব ছিল। এখন সেই স্নেহ আরও বাড়ল। গোপীদের প্রতি ভগবানের মাতৃভাবও আগে থেকেই ছিল। এখন মমতাযুক্ত হওয়াতে তার মাধুর্য আরও বাড়ল। এর ফলে ব্রজবাসীদের যশোদানন্দনের প্রতি আগে যে স্নেহ ছিল এখন নিজ সন্তানরূপে তাঁকে পেয়ে সেই স্নেহ আরও বেড়ে গেল। এক বছর পর্যন্ত তা এত বাড়ল যে তার আর সীমা রইল না। এভাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালকের রূপ ধরে আত্মস্বরূপ বৎসদের পালন করে প্রায় এক বছর বনে ও গোষ্ঠে লীলা করে বেড়ালেন।

বৎসরান্তে ব্রহ্মা কৌতূহলবশত একই স্থানে এসে দেখলেন চারণভূমিতে ধেনুরা বৎস-সহ চরছে, কৃষ্ণ সেই পূর্ববৎ সখা ব্রজবালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত। এই দৃশ্য দেখে ব্রহ্মার বিস্ময়ের সীমা থাকল না, কারণ গোকুলের যত বালক, ধেনু বৎস ছিল তারা সকলেই ব্রহ্মার মায়া শয্যায় শায়িত, অদ্যাবধি কাউকে জাগানো হয়নি। ব্রহ্মা ভাবছেন, তাঁর মায়ায় মোহিত বালকদের অতিরিক্ত এইসব ধেনু, বৎস ও বালকেরা এল কোথা থেকে, কীভাবে এল? ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ততগুলি বালকই দেখছেন যারা এক বছর যাবৎ খেলা করে আসছে। অনেক চিন্তার পরেও ব্রহ্মা বালকদের মধ্যে কারা সত্য, কারা মায়া তা নিরুপণ করতে পারলেন না। ব্রহ্মা বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করতে গিয়ে নিজেই মোহিত হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মা দেখে বিস্মিত হলেন, এই যে যমুনাপুলিনে বিচরণরত ধেনু, বৎস, ব্রজবালক, তাদের বংশী, পাচন সব কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণের অনুরূপ, কৃষ্ণময়। এইসব দেখে অতি বিস্ময়ে ব্রহ্মার চিত্ত আলোড়িত হতে লাগল। আনন্দে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হলো। ওইসব মূর্তির তেজে নিজেকে ব্রজাধীষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে বালকের ক্রীড়নক স্বরূপ একটি চতুর্মুখ মাটির পুতুলের মতো মনে হলো। পরম তেজঃস্বরূপ ভগবান বিষ্ণু তা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ মায়া যবনিকা অপসারণ করলেন। মায়া অপসৃত হওয়া মাত্র ব্রহ্মার বাহ্যদৃষ্টি লাভ হলো। মৃত ব্যক্তি জীবন পেলে যেমন উঠে দাঁড়ায় তিনি সেভাবেই উঠলেন এবং অতিকষ্টে চক্ষু উন্মিলিত করে নিজের সঙ্গে জগৎকে দেখলেন।

ব্রহ্মার আবার অদ্বয়, অনন্ত পরমব্রহ্মকে সেই বৃন্দাবনে নন্দদুলাল রূপী এক গোপবালকের বেশে দেখলেন। আগের মতোই তিনি খাদ্যের গ্রাস হাতে নিয়ে ইতস্তত বৎস ও আপন সখাদের অন্বেষণ করছেন। এই দৃশ্য দেখে ব্রহ্মা নতজানু হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে বসলেন এবং ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের যে অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন তা স্মরণ করে বারবার তাঁর পাদপদ্মে পতিত হলেন এবং সংযত চিত্তে শ্রীহরির স্তব করতে লাগলেন। অতঃপর হৃষ্টচিত্তে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সেই অভীষ্টকে তিনবার প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম করে নিজধামে প্রস্থান করলেন। ভগবান হরিও আত্মযোনি ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে অপহৃত ধেনু, বৎস ও ব্রজবালকদের যমুনা পুলিনে ফিরিয়ে আনলেন। □

নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে

প্রদীপ মারিক

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২২৮ অব্দে। তাঁর জন্মের সময় চারিদিকে অরাজকতা, নিপীড়ন অকথ্য অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছে ছিল। সেই নৃশংস পরিস্থিতি, থেকে মানবকুলকে বাঁচাতেই মর্ত্যে তাঁর আগমন। কংসের অত্যাচারে সেই সময় কারোর স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। নিজের বোনের সন্তানদের হত্যা করতেও তাঁর মনে এতটুকু মায়া অনুভূত হয়নি। দৈববাণী হয়, দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তানই হবে কংসের পতনের কারণ। সেই বাণী শোনার পর কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করে তাঁদের একের পর এক সন্তান হত্যা করে। কৃষ্ণের জন্মের সময় পুরো রাজপ্রাসাদ ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময় বসুদেব সদ্যোজাতককে মাথায় নিয়ে, যমুনা নদী পেরিয়ে বৃন্দাবনে নন্দলাল ও যশোদার কাছে রেখে আসেন। হিন্দুদের কাছে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মধুরা ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে মহা ধুমধাম সহকারে পালন করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে 'মোরমুকুটধারী' বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, তার মাথায় থাকা ময়ূর পালকের জন্য। ভগবান পরমেশ্বরের মাথায় কেন ময়ূর পালক থাকে তা নিয়ে কিছু প্রচলিত কাহিনি আছে। ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরাম এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। প্রচলিত যে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যখন রামচন্দ্র কাঁদতে কাঁদতে সীতামাতাকে খুঁজছেন ময়ূররা নাকি তাদের পেখম দিয়ে তাঁর চলার পথটি পরিষ্কার করে দেয়। ভগবান শ্রীরাম তাদের এই নিজস্ব ও নিষ্ঠার নিদর্শনে খুবই প্রসন্ন হন। শ্রীরামচন্দ্র কথা দিয়ে যান যে দ্বাপর যুগে তিনি আবার আবির্ভূত হবেন, তখন ময়ূরদের প্রতি সম্মান জানাতে এই পালক তিনি মাথায় ধারণ করবেন। তাই তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে ধরায় আবির্ভূত হন, তাঁর নিজের দেওয়া কথা রাখতে মাথায় ময়ূরের পালক পরেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দেবী পার্বতীর ভাই হিসেবে মানা হয়। শ্রীকৃষ্ণ কার্তিকের মামা হন। কার্তিকের বাহন

হলো ময়ূর। তাই মানা হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরের পেখম নিজের মাথায় ধারণ করেন যাতে কার্তিক, যিনি আবার যুদ্ধের দেবতা, তাঁর সমস্ত প্রয়াস যেন সার্থক হয়।

জনশ্রুতি, একদিন বড়োই মনোরম এক পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণ ও বাকি রাখালরা দুপুরে জঙ্গলে ঘুমোচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সবার আগে ঘুম থেকে ওঠে ও এই অপূর্ব পরিবেশে নিজের মনে বাঁশি বাজাতে শুরু করেন। অপূর্ব, মনোরম সেই সুর। তাঁর এই মিষ্টি সুরে সব প্রাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে নাচতে শুরু করে। এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একদল ময়ূরও ছিল। তাদের মধ্যে কিছু আবার সুরে বিভোর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বাঁশির সুর যখন বন্ধ হয়, তখন ময়ূররাজ শ্রীকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে আসে। তার সব পালক ঝরে পড়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই সব পেখমগুলো গুরুদক্ষিণা হিসেবে দান করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উপহার খুব আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেন এবং মাথায় সেগুলো ধারণ করেন। তিনি এই সময়ই জানান যে, তিনি এই পালক চিরকাল মাথায় পরবেন এবং অন্য কোনো প্রাণীর পালক এই স্থান নিতে পারবে না কোনোদিন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, তার জন্ম সাধারণ মানুষের মতো নয় এবং তাঁর মৃত্যুও সাধারণ মানুষের মতো নয়। তিনি বলেছেন, মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মারা যায়; কিন্তু তিনি জন্মরহিত হয়েও আবির্ভূত হন এবং অবিনশ্বর হয়েও অন্তর্ধান করে থাকেন। আবির্ভূত হওয়া এবং অন্তর্হিত হওয়া— দুটিই তার অলৌকিক লীলা। শ্রীকৃষ্ণের অন্যসব লীলার মতো তার জন্মলীলাতেও সুগভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব আছে, যা অনুশীলন করলে প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবৎ ভাবের সৃষ্টি হয়। বাহ্য জন্ম যেমন সত্য, তার চেয়েও অধিকতর সত্য অধ্যাত্ম জন্ম। সাধক ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের আধাত্ম্য জন্ম হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারে যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন দুরাচারী কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ সবাই। ভগবানের জন্মক্ষণে কোনো আনন্দ হয়নি, কোনো মাঙ্গলিক কাজ হয়নি। চারদিকে ভয়, আশঙ্কা, হত্যার ষড়যন্ত্র। পৃথিবীকে পাপভার, আশঙ্কা ও ত্রাসমুক্ত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পর কীভাবে তাকে রক্ষা করতে হবে সে কথা বসুদেবকে বলে দেন। তার কথামতো বসুদেব কারাগার থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। গোকুলে নন্দ ও যশোদার সন্তানরূপে যিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনি ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি যোগমায়া। যোগমায়ার প্রভাবে কংসের প্রাসাদে প্রহরীরা গভীর ঘুমে

আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কারাগারের দরজা আপনা থেকেই খুলে যায়। সে রাত ছিল ঘোর অন্ধকার। কিন্তু যখন বসুদেব তার শিশুসন্তানকে নিয়ে বাইরে আসেন তখন সবকিছু দিনের আলোর মতো দেখতে পান। আর ঠিক সেই সময় গভীর বজ্রনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে যাচ্ছেন তখন শেষনাগ বসুদেবের মাথার উপরে ফণা বিস্তার করেন। বসুদেব যমুনা তীরে এসে দেখেন যমুনার জল প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। কিন্তু এই ভয়ংকর রূপ সত্ত্বেও যমুনা বসুদেবকে যাওয়ার পথ করে দেয়। এভাবে বসুদেব যমুনা পার হয়ে অপর পাড়ে গোকুলে নন্দ মহারাজের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সব গোপ-গোপীকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেন। সেই সুযোগে তিনি নিঃশব্দে যশোদার ঘরে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে রেখে যশোদার সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে আসেন। নিঃশব্দে দেবকীর কোলে শিশুকন্যাটিকে রাখেন। তিনি নিজেকে নিজে শৃঙ্খলিত করেন যাতে কংস কিছুই বুঝতে না পারে।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের ক্রমক্ষীয়মাণ অবস্থা। শাস্ত্রে মনকে চন্দ্র বলা হয়েছে। চন্দ্রের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, মনেরও তেমন হয়। মন ইন্দ্রিয়ের রাজা। মন যতক্ষণ প্রবল থাকে ততক্ষণ চিত্ত চঞ্চল থাকে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মনশ্চন্দ্র অর্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। তখন চিত্তে ভগবদ আবির্ভাব সম্ভব। ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী। পিঙ্গলারূপী যমুনা নদীতীরে শ্রীকৃষ্ণের কত লীলা। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। অষ্টভূতে, অষ্ট প্রকৃতিতে ব্রহ্মাণ্ড রচিত। নবজাতক শ্রীকৃষ্ণকে কারাগার থেকে যমুনা পার হয়ে নন্দালয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখা যায় সর্প ফণা বিস্তার করে আছে। এই সর্প হলো সাধকের দেহস্থ জাগ্রতা কুণ্ডলিনী শক্তি। সাধক এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে করে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উত্থিত করেন। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, এক কথায় সর্ববিধ জীবনাচরণের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুগান্তকারী ঘটনা। নিরাকার পরব্রহ্ম ভগবানের সাকার রক্তমাংসের দেহধারী প্রকাশ সুগভীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধ্যানের দাবি রাখে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, যে তাঁর জন্ম, কর্ম ইত্যাদি সবই দিব্য এবং কেউ যখন তত্ত্বগতভাবে তা জানতে পারে, তখন তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

ভগবানের জন্ম একজন সাধারণ মানুষের মতো নয়। সাধারণ মানুষের জন্ম হয় কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। কর্মের ফলস্বরূপ সে এক দেহ থেকে অন্য আরেক দেহে দেহান্তরিত হয়। ভগবানের জন্মের কথা বিশ্লেষণ করে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছার প্রভাবে আবির্ভূত হন। যখন ভগবানের আবির্ভাবের সময় হলো, তখন কাল সর্বগুণ সমন্বিত হয়ে পরম সুন্দর হয়ে উঠল। তখন পৃথিবী আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিথি, যোগ ও নক্ষত্র তখন সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বসুলক্ষণ যুক্ত হয়ে উঠল। সর্বসুলক্ষণযুক্তা রোহিণী নক্ষত্র তখন তুঙ্গে প্রকাশিত হলো। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, নক্ষত্রের অবস্থান ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান ও প্রভাবের ফলে শুভ এবং অশুভ তিথি ও যোগ বিচার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় গ্রহগুলি সব সময় মঙ্গলময় অবস্থা এবং সব সময় শুভ ইঙ্গিত প্রদর্শন করে বিরাজ করতে লাগল। বনভূমি নানারকম সুন্দর সুন্দর পাখি ও ময়ূরপূর্ণ হয়ে উঠল। পাখিরা সুমধুর স্বরে গান গাইতে লাগল এবং সেই গানের ছন্দে ময়ূরেরা ময়ূরীদের সঙ্গে নাচতে শুরু করল। সুমধুর গন্ধ বহন করে বায়ু বইতে লাগল এবং শরীরের স্পর্শানুভূতি অত্যন্ত সুখকর বলে বোধ হতে লাগল। ব্রাহ্মণেরা অনুভব করল যে, তাদের গৃহের পরিবেশ যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুকুল হয়ে উঠেছে। আসুরিক রাজাদের অত্যাচারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান তখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যজ্ঞের আগুন প্রায় নিভে গিয়েছিল, কিন্তু আবার প্রশান্ত চিত্তে প্রজ্বলিত হতে সক্ষম হলো।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় তাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল, কেননা তারা নভোমণ্ডলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সূচক দিব্য শব্দতরঙ্গ শুনতে পেল। গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা সুমধুর সুরে গান গাইতে লাগল এবং সিদ্ধ ও চারণেরা ভগবানের গুণকীর্তন করে তাঁর স্তব করতে লাগল। স্বর্গলোকে দেবতারা তাঁদের সহচরী এবং অপ্সরাদের সঙ্গে সুললিত ছন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

দেবতারা ও মুনিঋষিরা পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। সমুদ্রের উপকূলে তরঙ্গের মৃদু মৃদু শব্দ হতে লাগল এবং সমুদ্রের উপরে সুমধুর মেঘগর্জন হতে লাগল। তখন ভগবান বিষ্ণু, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি রাতের গভীর অন্ধকারে পরমেশ্বর ভগবানরূপে দেবকীর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। পূর্ণচন্দ্র যেভাবে পূর্বদিগন্তে উদিত হয়, ঠিক তেমন ভাবেই পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হলেন।

খমাণিক্য নামক জ্যোতিষ শাস্ত্রগ্রন্থে ভগবানের আবির্ভাব সময়কালীন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই শুভ মুহূর্তে যে শিশুটির জন্ম হলো, তিনি হচ্ছেন পরম-ব্রহ্ম। বসুদেব দেখলেন যে, সেই অদ্ভুত শিশুটি চতুর্ভুজ। তিনি তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে আছেন। বক্ষে তাঁর শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে তাঁর কৌস্তভ শোভিত কণ্ঠহার, পরনে তাঁর পীতবসন, উজ্জ্বল মেঘের মতো তাঁর গায়ের রং, বৈদুর্য মণিভূষিত কিরীট তাঁর মস্তকে শোভা পাচ্ছে, নানারকম মহামূল্য মণি-রত্ন শোভিত সমস্ত অলংকার তাঁর দিব্য দেহে শোভা পাচ্ছে, তাঁর মাথা ভর্তি কুঞ্চিত কালো কেশরাশি। এই অদ্ভুত শিশুটিকে দেখে বসুদেব অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তিনি ভাবলেন কীভাবে একটি নবজাত শিশু এই রকম সমস্ত অলংকারে ভূষিত হলো? তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তখন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বসুদেব তখন ভাবতে লাগলেন, যদিও তিনি একজন সাধারণ মানুষ এবং বাহ্যিক দিক দিয়ে কংসের কারাগারে আবদ্ধ, তবুও পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু তাঁর স্বরূপ ধারণ করে তাঁর সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কোনও মনুষ্যশিশু এই ভাবে চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে অলঙ্কার এবং সবরকম দিব্য সাজে সজ্জিত হয়ে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত লক্ষণগুলি যুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না।

বসুদেব বারবার সেই শিশুসন্তানটির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন কীভাবে তাঁর এই পরম সৌভাগ্যের মুহূর্তটি তিনি উদ্‌যাপন করবেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন করতে বসুদেব দান করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কংসের কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাই মনে মনে তিনি ব্রাহ্মণদের হাজার হাজার গাভী দান করলেন। জন্মাষ্টমী হলো অশুভকে বিনাশ করে শুভ শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার উৎসব। বিশ্বাস ও একতা ধরে রাখতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনের মাধ্যমেই জন্মাষ্টমী পালন করেন আপামর সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। □

বৈষ্ণব ধর্ম হলো শক্তির উপাসনা, অহিংসার সাধনা নয়

আমরা যদি আজ অহিংসা আর শান্তির ভ্রমে পরবর্তী প্রজন্মকে শক্তিহীন, দুর্বল করে দিয়ে যাই তবে একদিন এই পশ্চিমবঙ্গেও আমাদের অবস্থা বাংলাদেশ-পাকিস্তান- আফগানিস্তানের হিন্দুদের মতো হবে।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

গয়া থেকে চম্বল এক্সপ্রেসে ফিরছি। ভোর ছ'টা হবে। হাওড়া ঢুকতে তখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকি। আমাদের কামরার কিছু সহযাত্রী বৃন্দাবন থেকে ফিরছেন। কারও কপালে চন্দনের ফোঁটা, কারও হাতে জপের মালা। এদের মধ্যে বছর পঁয়ষট্টির এক প্রৌঢ়, কপালে রসকলি, সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র ও ন' দশ বছরের নাতি। কামরা জুড়ে বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা চলছে। প্রৌঢ় বাকিদের বোঝাচ্ছেন এই কলিযুগে মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হলো কৃষ্ণনাম। সাধনে-ভজনে, জপে-কীর্তনেই হবে মোক্ষপ্রাপ্তি। আলোচনা যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই ওপরের স্লিপার থেকে নেমে এলো আমার বন্ধু সৌরিন। এসে বসলো প্রৌঢ়ের পাশে। যোগ দিল তাদের সেই আলোচনায়। প্রৌঢ় সৌরিনকে পেয়ে নতুন উৎসাহে ভক্তিতত্ত্ব শোনাতে শুরু করলেন— এ যুগে নামসাধন ও অহিংসা, এই হলো মানবের একমাত্র ধর্ম। নান্য পন্থা।

সৌরিন শান্তভাবে প্রৌঢ়ের কথা শুনছিল। ভালো শ্রোতা পেয়ে তিনিও দ্বিগুণ উৎসাহে বৈষ্ণব ধর্মের গূঢ় তত্ত্বগুলি বোঝাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সৌরিন মুখ খুললো। বলল— কাকু, আপনারা থাকেন কোথায়? প্রৌঢ় বললেন, চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া। সৌরিন বলে, আপনারা মূলত এই বাঙ্গলার না ওপার বাঙ্গলার? প্রৌঢ় বলে, আমার জন্ম এখানেই, তবে আমার বাবা-কাকারা দেশভাগের সময় সবাইকে নিয়ে ফরিদপুর থেকে এদেশে চলে এসেছে। সৌরিন বলে, আচ্ছা, বাকিরাও কি তাই? একজন বলল, না ভাই, সকলে নয়, অনেকেই। তবে আমি সাতপুরুষের এদেশীয়, এখানেই সব। সৌরিন বলে, আপনারা তো সকলেই বৈষ্ণব। আমার অবশ্য বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান কম। ভালোই হলো। হাওড়া পৌঁছতে বেশ কিছুটা বাকি আছে, ততক্ষণে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু শিখতে পারবো। আচ্ছা বলুন তো বৈষ্ণব মানে কী? প্রৌঢ় বলেন, বৈষ্ণব মানে বিষ্ণুভক্ত। ভাগবত মতে ভগবান বিষ্ণুই হলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, জগতের পিতা। আর বিষ্ণুর যারা উপাসক তারাই বৈষ্ণব। বড়ো কথা হলো, বৈষ্ণব মানে অহিংসা। সৌরিন

বলে, বাহ্, সহজ ব্যাখ্যা।

কিন্তু আমার একটা ছোটো প্রশ্ন, আপনি যে বললেন বৈষ্ণব মানে অহিংসা, সেটা কোত্থেকে এলো? প্রৌঢ় বলেন এ কী প্রশ্ন? বৈষ্ণব ধর্মের মূলে আছে মানবতা ও অহিংসা। প্রেম ও ভক্তিভাব হলো এর মূল ভিত্তি। সৌরিন বলে, আচ্ছা, আমাদের মূল ধর্মগ্রন্থ তো গীতা, তাই না? প্রৌঢ় বলেন, একদম ঠিক। গীতা হলো বৈষ্ণবদের চলার পাথেয়। সৌরিন বলে, গীতা যদি আমাদের অনুসরণীয় হয় তবে গীতা কী, গীতা কীভাবে অবতীর্ণ হলো, কে কাকে উপদেশ দিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই আমাদের সবার জানা। আমি যতদূর জানি গীতা হলো আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্রের মাঠে কৌরব ও পাণ্ডব দুই পক্ষের যুদ্ধ শুরুর আগে দুই বীরের কথোপকথন। এক বীর হলেন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ, আর এক বীর হলেন সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুন, ঠিক কিনা? প্রৌঢ় বলেন, হ্যাঁ বাবা একদম সঠিক। সৌরিন বলে, এবার বলুন কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় কী উপদেশ দিয়েছিলেন? যুদ্ধ করতে, না যুদ্ধ না করতে? অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-গুরুজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন, ধনুর্বাণ মাটিতে নামিয়ে রেখেছিলেন, অহিংসা ও শান্তির কথা বলেছিলেন, তখনই না শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভীরু ক্লীব বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বলেছিলেন 'হে পার্থ, ক্লীবত্ব নয়, যুদ্ধই বীরের ধর্ম, অস্ত্র তোলো, যুদ্ধ করো'। কি বলেছিল কিনা? তবে কী দাঁড়ালো? গীতা হলো ধর্মযুদ্ধের প্রেরণার বাণী। গীতার প্রথম অধ্যায়ও শুরু হয়েছে 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ' মহাযুদ্ধের আহ্বানের শ্লোক দিয়ে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেখানে গীতায় বলছেন, 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' অর্থাৎ ভালো মানুষের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্টের বিনাশের জন্য আমি যগে যুগে অবতীর্ণ হই, সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুসারী হয়ে আপনারা বৈষ্ণবধর্মে অহিংসা , শান্তি এসব কোথায় পেলেন?

প্রৌঢ়ের দুচোখে বিস্ময়। বলেন, তোমার কথায় যুক্তি আছে বাবা, কিন্তু....। সৌরিন বলে, আচ্ছা বলুন পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণের সবচাইতে প্রিয় কে ছিলেন — অর্জুন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব নয়। যুধিষ্ঠির তো শ্রীকৃষ্ণকে সবচাইতে বেশি ভক্তি করতেন, তবু যুধিষ্ঠির নয়। কেন নয়?। কারণ অর্জুন ছিলেন শ্রেষ্ঠ বীর। বীরেরাই ভগবানের প্রিয়পাত্র হন, শক্তিহীনেরা নয়।

অন্য যাত্রীরা তখন নড়েচড়ে বসছে। সৌরিন বলে, যে কৃষ্ণকে আমরা ভক্তি করি, তিনি তো সুদর্শনধারী। সেই সুদর্শন কি ভজন, কীর্তন, জপতপের সামগ্রী না বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্-এর অস্ত্র? এখন বলুন সেই শস্ত্রধারী কৃষ্ণের অনুসারী হয়ে বৈষ্ণবরা কেন অহিংসার কথা প্রচার করে?

প্রৌঢ়ের কপলে চিন্তার ভাঁজ। সৌরিন বলে, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কতজন শত্রুকে নিজের হাতে বিনাশ করেছেন তার হিসাব করেছেন? পুতনা, কালিয়ানাগ, বকাসুর পঞ্চজন রাক্ষস, নরকাসুর, অঘাসুর, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দণ্ডবক্র-সহ কত পাপীতাপীকে বধ করেছেন। এমনকী নিজের মামা অত্যাচারী কংসকেও তিনি সংহার করেছেন। মিথ্যা ছল কপটতাকে আমরা সবাই গর্হিত অপরাধ বলেই জানি। কিন্তু অধর্মের বিনাশের জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি সেই পাপ করার জন্য পাণ্ডবদের পরামর্শ দিয়েছেন। অভিমন্যুকে হত্যার মূলচক্রী জয়দ্রথকে হত্যার জন্য তিনি কি কপটতার আশ্রয় নেননি? জরাসন্ধের দুই পা চিরে হত্যার ইশারা তিনি তো ভীমকে করেছিলেন। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে বধ করার জন্য চির সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এই অর্ধসত্য বলতে তিনিই তো শিখিয়েছিলেন। এমনকী যে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনিই একবার ক্রোধান্বিত হয়ে রথের চাকা তুলে পিতামহ ভীষ্মকে মারতে উদ্যত হয়েছিলন। এগুলি কি অহিংসার লক্ষণ না সমাজ ও ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে সহিংস হওয়ার প্রমাণ? গীতার এই মূল তত্ত্বকে ছেড়ে শ্মশানযাত্রার সময় মৃত মানুষের বুকে গীতা রেখে গীতার মহত্ত্বকে কি আমরা ছোটো করে ফেলছি না?

সারা কামরা নিশ্চুপ। প্রৌঢ়ের ছেলে বললে, কিন্তু কাকু শ্রীকৃষ্ণ তো ছিলেন অবতার পুরুষ, মানুষ। তাই সেই যুগে মানুষ হিসেবে তাঁর যা কর্তব্য তাই তিনি করেছেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু তো শান্তির প্রতিমূর্তি। আমরা তাঁরই উপাসক, বৈষ্ণব।

সৌরিন বলে, তাই? আচ্ছা বলতো অসুর হিরণ্যাক্ষকে বরাহ রূপ ধারণ করে কে হত্যা করেছিলেন? প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে নরসিংহ রূপ ধরে কে সংহার করেছিলেন? কত দানব, অসুরের সংহার স্বয়ং নারায়ণ করেছেন তা বিষ্ণুপুরাণ ঘেঁটে দেখো। আচ্ছা, চতুর্ভুজ নারায়ণের রূপ মনে মনে কল্পনা করে দেখো তাঁর চার হাতে কী কী অস্ত্র আছে। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম— তার মানে দুই হাতে চক্র ও গদা, যা অত্যাচারী ও পাপীদের নিধনের অস্ত্র। অন্য দুই হাতে শঙ্খ ও পদ্ম যা শান্তি ও প্রেমের প্রতীক ভাবতেই পারো। তার মানে ভগবান বিষ্ণু শক্তি ও ভক্তির যুগলবন্দি। তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর অসুর সংহারক রূপ ভুলে তাঁকে কেবল ভক্তি ও প্রেমের দেবতা রূপে দেখি?

সৌরিনের অকাট্য যুক্তিতে প্রৌঢ় বলেন, তা বাবা, আমরা কি অতশত বুঝি? কলির অবতার চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের প্রেমের যে পথ দেখিয়ে গেছেন সে পথেই আমরা চলেছি। যিনি জগাই-মাধাইয়ের কাছে আঘাত পেয়েও প্রত্যাঘাত করেননি, বরং তাকে প্রেম বিতরণ করেছেন, সবাইকে কৃষ্ণনাম বিলিয়েছেন, তাঁর সেই প্রেম ও শান্তির পথই বৈষ্ণবদের পথ।

সৌরিন বলে— ভুল, ভুল, ভুল। আমরা তাঁর কর্মকাণ্ডের ভুল ব্যাখ্যা করেছি। বঙ্গপ্রদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব একদিকে নামজপের কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে তিনিই 'সঙ্ঘশক্তি কলি যুগে' এই বাণীরও উদ্‌গাতা। জাতপাতে বিভক্ত হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের বাঁচার মন্ত্র দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ইসলামি শাসনে হিন্দুদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল— হয় ইসলাম, নয় মৃত্যু। সেই রাক্ষসদের শাসনকালে জাতপাতে বিভক্ত হিন্দু সমাজ যখন অসহায়, হাজার হাজার বছরের পূর্বপুরুষের ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে, ঠিক এমনই সময়ে আজ থেকে প্রায় পাঁচশো ছত্রিশ বছর আগে তিনি হরিবোল আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের বাঁচার পথ দেখিয়েছিলেন। ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর— 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এই নামে খোল করতাল নিয়ে দলবদ্ধভাবে পথে পথে সংকীর্তনের মাধ্যমে হিন্দুদের সংগঠিত করেন। কমিউনিস্টরা দাবি করে গণ-আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান

এসব নাকি মার্কস, লেনিন, স্তালিন শিখিয়েছেন। হায়রে হতভাগ্য বাঙ্গালি কুলাঙ্গারের দল! একটু শ্রীচৈতন্যের জীবনী 'চৈতন্যচরিতামৃত' বইটা পড়ে দেখো, বুঝবে তোমাদের ওই বিদেশি বাপদের জন্মের কয়েকশো বছর আগেই শ্রীচৈতনদেব বাঙ্গালিকে জন-আন্দোলনের মাধ্যমে কীভাবে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হয় তা শিখিয়ে গেছেন। ইনকিলাব জিন্দাবাদের বিদেশি বিদঘুঁটে ভাষা নয়, একদম খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা— হরিবোল। কৃষ্ণনামও যে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের হাতিয়ার হতে পারে তা তিনি হাতে-কলমে বাঙ্গালিকে শিখিয়েছিলেন, কিন্তু তা আমরা শিখলাম কই?

প্রৌঢ় বলেন— কিন্তু বাবা, সে তো নিরস্ত্র আন্দোলন। অহিংসার পথ। সৌরিন বলে, ভুলে গেলেন সেই কাহিনি? মুসলমান শাসক চাঁদ কাজি হিন্দুদের প্রকাশ্যে কৃষ্ণনাম করলে মৃত্যুদণ্ড দেবার ফতোয়া দিয়েছিল। একদিন মধ্যরাতে চাঁদ কাজির প্রাসাদ ঘিরে ফেললো কয়েক হাজার বৈষ্ণব। হাতে মশাল, মুখে কৃষ্ণনাম। হঠাৎ আক্রমণে হতভম্ব চাঁদ কাজি চোরের মতো লুকিয়েছিল খাটের তলায়। চৈতন্যদেবের বজ্রনির্ঘোষ— চাঁদ কাজি বেরিয়ে আয়, নয়তো বাড়ি জ্বালিয়ে দেব। প্রাণ বাঁচাতে চাঁদ সেদিন এসে পড়েছিল তাঁর পায়ে। তাঁকে 'বাপ্' বলে সম্বোধন করে তুলে নিয়েছিল অন্যায় বিধান। মশালের আগুনে চাঁদ কাজিকে পুড়িয়ে মারার হুংকার যিনি দেন তিনি কি অহিংসার পূজারি, নাকি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সহিংসতার প্রতিমূর্তি? আমাদের শাস্ত্রে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ, ধর্ম হিংসা তথৈব চঃ' অর্থাৎ অহিংসা বড়ো ধর্ম, কিন্তু ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে সহিংসতা তার চেয়েও বড়ো ধর্ম— এই আপ্তবাক্যের সফল রূপকার তো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই।

নিঃশব্দ কামরা। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো গিলছিল সৌরিনের কথা। সে বলে, কাকু একবার ভাবুন। এই সেদিন ১৯৪৭ পর্যন্ত যে বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম গানে মাতোয়ারা হতো, আজ কি সেখানে তা হয়? ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজী মহারাজ, মতুয়া সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর, সৎসঙ্গের ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, সন্তানদলের বালক ব্রহ্মচারী, লোকনাথ বাবার লক্ষ লক্ষ ভক্ত, তাঁরা কি শেষ পর্যন্ত তাঁদের জন্মভূমিতে থাকতে পেরেছেন? না, তারা সকলে পালিয়ে এসেছেন ভারতে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গে। আজকের দিনে তাঁরা একটি বারের জন্যও ভাবতে পারেন না তাদের আরাধ্য গুরুদের সাধের জন্মভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রবর্তিত শান্তির ধর্ম, প্রেমের বাণী প্রচার করার কথা। কারণ সে আজ বিধর্মীর দখলে। হাতে গোনা যে কজন হিন্দু এখনও সেখানে আছে, তারা সেখানে মরে বেঁচে আছে। তারা সংখ্যায় নগণ্য, শক্তিহীন। কেবল ভক্তিতে মানবের উদ্ধার হয় না, তার সঙ্গে চাই শক্তি। আমাদের অস্ত্রধারী দেব-দেবীরা সে শিক্ষা দিয়ে গেলেও সন্ত-মহাত্মারা আমাদের সে কথা শেখালেন কই?

প্রৌঢ় বলেন— তা বাবা, ওইসব পুরানো দিনের কথা মনে রেখে কী লাভ? বরং আমাদের ছেলেপুলে, নাতি-নাতনিরা যাতে আগামীদিনে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বাঁচাতে পরে তার শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। সৌরিন বলে, ভুলেই তো ছিলেন। বাপ্-দাদা চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে পথের ভিখারি হয়ে এদেশে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন এবার বোধহয় বেঁচে গেলাম। কিন্তু তা হলো কই? এ ক'বছর ধানতালা, দেগঙ্গা, ক্যানিং, উস্তি, কালিয়াচক, নলিয়াখালি, বসিরহাট, ধুলাগড়ের দাঙ্গা কী আপনাদের সেই অভিশপ্ত স্মৃতি ভুলতে দিয়েছে? আর কোন ভক্তিভাব দিয়েই বা আমরা একে রোধ করতে পেরেছি? বরং দাঙ্গার সময় সব হিন্দু একজোট হয়ে লাঠি-দা-কাটারি- বঁটি যার ঘরে যা অস্ত্র ছিল নিয়ে প্রতিরোধে যখন ঘুরে দাঁড়ালাম, তখন দাঙ্গাবাজরা পিছু হঠল।

এতে কী শিখলাম? অস্ত্র দিয়েই অসুরদের প্রতিরোধ করতে হয়, শুধু জপ-মালা-টিকি-তিলক দিয়ে বাঁচা যাবে না। বিপদে বংশীধারী কৃষ্ণ নয়, চক্রধারী কৃষ্ণই ত্রাতা। একথা ভুললে আবার দেশভাগ, আবার বোঁচকাবুঁচকি বাঁধা, আবার পলায়ন। প্রৌঢ় বলেন— তাঁর ইচ্ছায় জন্ম, যদি তার নাম না করি তবে ওপরে গিয়ে কী জবাব দেব? সৌরিন বলে— নামগান করুন, কে বারণ করেছে? শঙ্খধারী বিষ্ণু কী চক্র ধরেন না? ভক্তের ভগবান হলে কী শয়তানের মোকাবিলা করায় বারণ আছে? তাছাড়া সত্যিকারের স্বর্গ আছে কিনা আমরা কেউ দেখিনি। কিন্তু আমার গ্রাম, আমার রাজ্য, আমার দেশ--- এতো সত্যি। আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে এখানেই বাস করতে হবে— এ আরও বড়ো সত্যি। আমরা যদি আজ অহিংসা আর শান্তির ভ্রমে পরবর্তী প্রজন্মকে শক্তিহীন, দুর্বল করে দিয়ে যাই তবে একদিন এই পশ্চিমবঙ্গেও আমাদের অবস্থা বাংলাদেশ-পাকিস্তান- আফগানিস্তানের হিন্দুদের মতো হবে। একদিন এই বঙ্গপ্রদেশে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, লোকনাথ, অনুকূলচন্দ্র, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নেওয়ার মতো লোক থাকবে না। তাই ছোটোখাটো খাল-বিল-নদী-নালা যেমন থাকে, তেমনি বিভিন্ন মত-পথ-উপাসনা পদ্ধতি স্বমহিমায় থাক। কিন্তু তারা যেন মনে রাখে আমরা সকলে হিন্দু নামের এক বিরাট মহাসমুদ্রের অংশ। তবেই শক্তি আর ভক্তির সংমিশ্রণে গড়ে উঠবে বিশাল অপরাজেয় হিন্দু সমাজ। একথা ভুললে সবার ধ্বংস অনিবার্য।

হঠাৎ ছোট্ট ঝাঁকুনিতে ট্রেন থেমে গেল। জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখলাম হাওড়ায় পৌঁছে গেছি। সৌরিনকে বললাম, চল এবার নামতে হবে। বাংক থেকে ব্যাগ নামিয়ে এগোতে যেতেই প্রৌঢ় সৌরিনের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, আজ তোমার কাছে অনেক কিছু শিখলাম বাবা। তোমার ফোন নম্বরটা যদি দিয়ে যাও। আমাদের ধর্মসভায় তোমাকে একদিন ডাকবো। এই কথাগুলো সেদিন আমার বন্ধুদের ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে। সৌরিন পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে প্রৌঢ়ের হাতে দিল। তারপর দুজনে প্লাটফর্মে পা বাড়ালাম। □

পাশ্চাত্যের মাটিতে পুনরুচ্চারিত হলো হিন্দুত্বের জয়ঘোষ

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রামকথা শুনতে এসে তাঁর ভাষণে বললেন— "শ্রীরাম আমার অনুপ্রেরণা, আমি হিন্দু হিসেবে গর্বিত"। এ ঠিক যেন বিদেশের মাটিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি। বিশ্ব বিজয় করে ভারতে ফিরে এসে পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত জাতিকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের আত্মপরিচিতি। বর্তমান ভারতেও তথাকথিত প্রতিশীলরা এখনো নিজেকে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন। কেউ পরিচয় দিলে সাম্প্রাদয়িক বলে চিহ্নিত হন। সেখানে বিদেশের মাটিতে নিজেকে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিয়ে ঋষি সুনক ভারতের তথাকথিত প্রগতিশীলদের মুখে একটি বিরাশি সিক্কার চপেটাঘাত কষিয়ে দিলেন। যদিও তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সাউদাম্পটনে জন্ম, বেড়ে ওঠা। প্রথমে উইনচেস্টার কলেজের স্নাতক ও পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লিঙ্কন কলেজ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করে সুনক কনজারভেটিভ পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁর হাত ধরে একটি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির সূত্রপাত যাদের কর্মধারা সিলিকন ভ্যালি থেকে ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত বিস্তৃত । ২০১৫ সালে জয়ী হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমনসের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ফর লোকাল গভর্নমেন্ট, ২০২০ সালে অর্থমন্ত্রী ও ২০২২ সালের ২৪ অক্টোবর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। বিদেশে জন্ম, বড়ো হয়ে সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পদে উন্নীত হলেও শিকড়কে ভুলে যাননি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। গত ১৫ আগস্ট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রামকথার আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রামকথা শুনলেন ঋষি সুনক। তাঁর ভাষণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হলো ভারতের সঙ্গে তাঁর আত্মার টান।

যদিও তিনি জানান যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নন, একজন হিন্দু হিসেবে তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে তাঁর কাছে বিশ্বাস একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয়। জীবন দর্শনের প্রতিটি পদে এই বিশ্বাস তাঁর পথপ্রদর্শক। ভারতের স্বাধীনতা দিবসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোরারি বাপু কথিত রামকথা শুনতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশি ও গর্বিত। সামাজিক মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সুনকের আরতি করার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। ভক্তি সহকারে তিনি 'জয় সিয়ারাম' ধ্বনি দেন। হনুমানজীর ছবিতে প্রণাম করে তিনি বলেন, 'ঠিক যেমন বাপুর পিছনে সোনালি রঙের হনুমানজী রয়েছেন, ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে আমার ডেস্কেও আলো করে বসে রয়েছেন সোনালি রঙের শ্রীগণেশ।'

বক্তব্যের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি যেমন একজন ব্রিটিশ হিসেবে গর্বিত, তেমন হিন্দু হিসেবেও গর্বিত। শৈশবে ভাই-বোনদের সঙ্গে মন্দিরে যাওয়ার স্মৃতি তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমি এখান থেকে রামায়ণ, ভগবতগীতা ও হনুমানচালিশার পাঠ স্মৃতি হিসেবে নিয়ে যাচ্ছি। আমার শ্রীরাম সবসময় অনুপ্রেরণামূলক ব্যক্তিত্ব, যিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সাহসের সঙ্গে জীবনে প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, কীভাবে মানবতা ছড়িয়ে দিতে হয় এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্য কাজ করতে হয়।" একজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণে ভারতের সনাতন, শাশ্বত বাণীর প্রতিধ্বনিতে স্পষ্টভাবে যেন পরিলক্ষিত হলো স্বামীজীর আদর্শের বিচ্ছুরণের এক অপরূপ ঝলক।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৩০ বছরেরও বেশি আগে তাঁর দিব্য অন্তর্দৃষ্টি সহকারে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে অমানিশার ঘোর কাটিয়ে ভারত-সিংহের তন্দ্রা ভাঙছে। হাতছানি দিচ্ছে ভবিষ্যতের এক বৈভবশালী ভারত। তিনি বলেছেন— "আমি নিজেকে একজন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৯, উদ্বোধন কার্যালয়)।

নতশিরে হিন্দুত্বের পরিচয়দানের পরিবর্তে হিন্দুত্বের মহান সত্তায় শ্লাঘাবোধ করার নির্দেশ দিয়ে বীর গৈরিক সন্ন্যাসী ঘোষণা করলেন— "তুমি যদি হিন্দু হও তবে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বলো, 'আমি হিন্দু'। লজ্জা কীসে? তোমার ধর্ম তোমার অহংকার!" ▯

উচ্চতা পরাজিত আজ

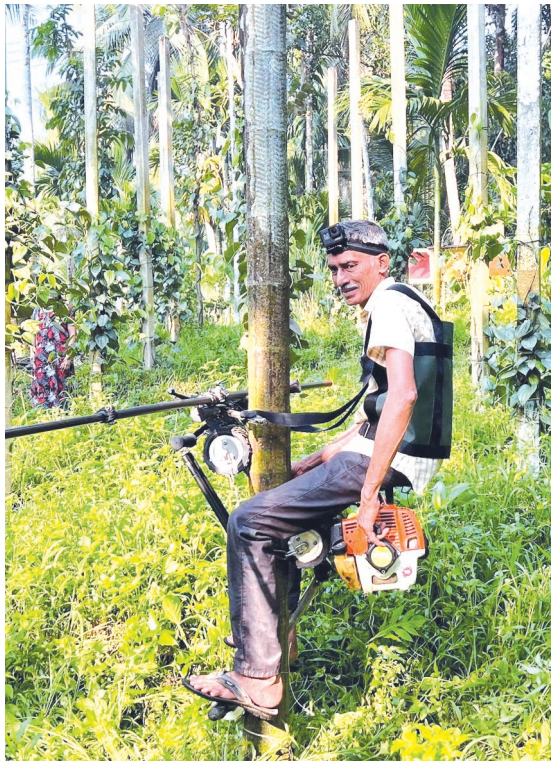

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরের গণপতি ভট্টের আবিষ্কৃত 'স্কুটার' রাস্তায় নয়, গাছে চড়তে সাহায্য করে। শুনে অদ্ভুত মনে হলেও এই ঘটনা সত্যি। ভৌতবিজ্ঞানের স্নাতক কোমালেগাঁওয়ের গণপতি এমন একটি স্কুটার তৈরি করেছেন, যা ৬০-৭০ ফুট উঁচু সুপুরি বা নারকোল গাছে সহজভাবে ওঠানামা করতে সক্ষম। তাঁর আবিষ্কৃত এই স্কুটার বা গাছে চড়ার যন্ত্রের নাম অ্যারেকা।

২৮ কিলোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট এই স্কুটার ৬০-৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগ সম্পন্ন, যা মোট ৮০ কিলোগ্রাম ওজন বহন করে গাছে উঠতে সক্ষম। এই যন্ত্র গড়ে ১ লিটার পেট্রোল খরচে ৮০টিরও বেশি গাছে চড়ার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। হাইড্রোলিক ড্রাম ব্রেক, এন্ড গিয়ার, একটি ডবল চেন ও একটি সুরক্ষা বেল্টের সমন্বয়ে গঠিত গণপতির এই গাছে চড়ার যন্ত্র সুপুরি চাষিদের উঁচু সুপুরি গাছে চড়ার সমস্যা সমাধানের একমাত্র যন্ত্র।

নারকোল ও সুপুরি চাষ কৃষকদের জন্য বিশেষ লাভজনক। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ কৃষক এই চাষে নিরুৎসাহিত বোধ করেন। এর কারণ হলো বিরাট উঁচু এই নারকোল ও সুপুরি গাছে ওঠা একটি কঠিন কাজ। এই গাছগুলি খাড়া ও শাখা-প্রশাখাবিহীন হওয়ার দরুন এই গাছে চড়া রীতিমত একটি চ্যালেঞ্জ। বর্ষাকালে নারকোল ও সুপুরি গাছে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সেই সময়ে গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গাছে ও ফলে কীটনাশক স্প্রে করা জরুরি। কিন্তু গাছে না উঠে সেই কীটনাশক স্প্রে করা একটি অসম্ভব কাজ। তাও কীটনাশক ও তা স্প্রে করার যন্ত্র সমেত গাছে ওঠা খুবই কঠিন। এইসব কারণে চাষিরা অনেক ক্ষেত্রেই নারকোল ও সুপুরি চাষে বিশেষ আগ্রহী হন না।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে গেছে। গণপতি নির্মিত এই স্কুটার মাত্র ৩০ সেকেন্ডে কৃষকদের গাছের মাথায় পৌঁছে দিতে পারে। যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া গাছে উঠতে ৪-৫ মিনিট সময় লেগে যায়। ৬০ বছর বয়সি গণপতি বলেন যে, "প্রযুক্তি আজ মানব জীবনকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজ-সরল-সুন্দর করে তুলেছে। এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে সুপুরি চাষিদের এই কঠিন জীবন আমায় গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রতিদিন চাষিদের গাছে চড়া আমি দেখতাম এবং নিজেও গাছে উঠলে সেই কষ্ট অনুভব করতাম। তখন মনে একটি ভাবনার উদয় হলো। প্রযুক্তির সাহায্যে এই কষ্ট দূর করা যদি সম্ভব হয়। বিজ্ঞানের স্নাতক হওয়ার কারণে মাথা খাটিয়ে একটা বুদ্ধি বের করি। এই বিষয়ে কাজ শুরু করলাম এবং এমন একটি স্কুটার তৈরি করলাম যা আজ আমাকে সহ অনেকগুলি রাজ্যের কৃষকদের সহায়তা করছে"।

আনন্দের সঙ্গে গণপতি জানালেন যে, কৃষকেরা এই যন্ত্রের বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে যন্ত্রটি কেনার চেষ্টা করছেন। কর্ণাটক,তামিলনাড়ু, কেরল ও অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকদের খুব কাজে এসেছে এই স্কুটার। এখনও পর্যন্ত কয়েক হাজার স্কুটার বিক্রি হয়েছে। একটি স্কুটারের দাম ৭৫ হাজার টাকা। গণপতি আবিষ্কৃত এই স্কুটারটি মাহিন্দ্রা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। তিনি ট্যুইট করে এই আবিষ্কারের প্রশংসা করেছেন। ট্যুইটে তিনি লেখেন— "কী দারুণ একটি আবিষ্কার! যন্ত্রটি শুধু কার্যকরী ও বিশেষ দক্ষই নয়, খুব কম ওজনের ও সুন্দর গঠনের।"

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সুপুরি উৎপাদনে কর্ণাটক ভারতের মধ্যে ও ভারত গোটা বিশ্বে শীর্ষ স্থান অধিকার করে। এই প্রেক্ষাপটে গণপতি ভট্টের এই অপূর্ব আবিষ্কার সুপুরি ও নারকোল চাষিদের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ। বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্ভাসিত গণপতি ও তাঁর আবিষ্কৃত এই স্কুটার ভারতবর্ষ জুড়ে ভবিষ্যতে নারকোল ও সুপুরি চাষের ক্ষেত্রের বহুল প্রসার ঘটাতে সক্ষম ও বহু কৃষকদের কাছে এই চাষের প্রেরণার এই উজ্জ্বল উৎস। □

ব্যাং ও বৃষ্টি

গতকাল থেকে বৃষ্টি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। পুকুর, নদী-নালা সব জলে টইটম্বুর। কোলাব্যাং সোনাব্যাং সবারই খুব আনন্দ। বৃষ্টির নতুন জল পেয়ে সব ছানাপোনা কীরকম সারাদিন

হেসেখেলে বেড়াচ্ছে, টুপ টুপ ডুব দিচ্ছে জলে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাবে এঁদো পুকুরের পাড়ে ব্যাঙেদের গানের আসর। আসর বললে ঠিক হবে না, আসলে এটা একটা বিশাল প্রতিযোগিতা। সোনাব্যাং ও কোলাব্যাঙের ব্যস্ততার সীমা নেই। সন্ধ্যে হতে না হতেই ছানাপোনাদের সঙ্গে করে থপ থপ পা ফেলে এসে একটি বাঁশের মাচার ওপর চড়ে বসল।

সোনাব্যাং হাঁক পাড়ল, শোনো বাচ্চারা, আর কদিন পরেই শুরু হতে চলেছে সবচাইতে বড়ো গানের প্রতিযোগিতা, ওই এঁদো পুকুরের ধারে। সুতরাং সময় নষ্ট করলে মোটেই চলবে না। এখন সব দুষ্টুমি বন্ধ রেখে সকলে গানে মন দাও। ভালোভাবে অভ্যেস করতে হবে। সোনাব্যাঙের কথা শেষ হতেই ছানাপোনারা আনন্দে হইহই করে উঠল। কোলাব্যাং বলল, চুপ করো সকলে। গান হলো সাধনা। এত হুটোপুটি করলে কখনোই গান শেখা হবে না। বৃষ্টির নতুন জল দিয়ে গলা ভালো করে গারগেল করে নাও।

সকলে কোলাব্যাঙের কথামতো কাজ সেরে উৎসাহে অপেক্ষা করতে লাগল। সোনাব্যাং গলা ছেড়ে গান ধরল। সেই সুর শুনে জোনাকিরা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দলে দলে হাজির হলো পুকুর পাড়ে। ছোটো ছোটো মাছেরা মাঝ পুকুরে গোল হয়ে নাচতে লাগল। পুকুরপাড়ের যে কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালটা জলে নুইয়ে পড়েছে তাতে হুতোম পেঁচা চুপটি করে বসে সোনাব্যাঙের গান শুনছিল। কতদিন পরে এমন আসর বসেছে। সোনাব্যাং গান গাইছে। কোলাব্যাং ও ছানাপোনারাও পাল্লা দিয়ে গাইছে।

কিন্তু এত আনন্দের মাঝে একজনের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। সে হলো এক কোকিল। সে কিছুদিন হলো কৃষ্ণচূড়া গাছটার মগডালে কাকের একটা পুরনো বাসা খুঁজে নিয়েছে। ব্যাংদের এই হইচইয়ে তার ঘুমের বারোটা বেজে গেল। বাসা থেকে বেরিয়ে সে ধমকের সুরে বলল, এই থামো তোমরা। কখন থেকে হেঁড়ে গলায় গ্যাঙর গ্যাং করেই চলেছ। তোমরা কি একটু মিষ্টি সুরে গান গাইতে পারো না? ধমক খেয়ে সবাই চুপ করে গেলেও সোনা ব্যাং তার গান চালিয়েই গেল। তখল কোকিল উড়ে গিয়ে সোনাব্যাঙের পাশে বসল। বলল, চলো, আমি তোমাদের গান শেখাবো।

সোনাব্যাং ধীর গলায় বলল, ঠিক আছে কিন্তু তার আগে তোমায় যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। কোকিল মুচকি হেসে বলল, আমার যোগ্যতার প্রমাণ? সে তো সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডই জানে। আমার মধুর সুরে দখিনের হাওয়া ছুটে আসে। চাঁপা, কদমফুল ফোটে গাছে গাছে।

সোনাব্যাং মাথা হেলিয়ে বলল, তা বেশ বেশ, কিন্তু তোমার গান দিয়ে কি তুমি পারবে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরাতে? কোকিল গর্বের সঙ্গে বলল সে আর এমন কী! এই দেখো, বলে গান ধরল। কিন্তু সেই গানের দক্ষিণের হাওয়া ছুটে এল না ঠিকই কিন্তু চাঁপা কদম ফুল চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু বৃষ্টি কোথায়? সকলেই অপেক্ষায় রয়েছে। কোকিল গেয়েই চলেছে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ল।

হুতোম পেঁচা মুচকি হেসে বলল, অনেক হয়েছে ভায়া, এইবার ক্ষান্ত দাও। হুতোমপেঁচাকে আগেই বিচারকের আসলে বসানো হয়েছিল। তাই কোকিল বিশেষ কিছু না বলে থেমে গেল।

এইবার হুতোমপেঁচা হাঁক পাড়ল, ব্যাঙেরা এইবার তোমরা শুরু করো। সোনাব্যাং চোখ বন্ধ করে গান ধরল। কোলাব্যাং সঙ্গে সঙ্গে তাল ধরল। ছানাপোনাগুলো এত সুন্দর স্বর মেলাল যে, আসর আবার জমজমাট হয়ে উঠল। মাঝ পুকুরে মাছেরা গোল হয়ে নাচতে লাগল। জোনাকিরা দলে দলে আসতে লাগল। ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এল। সেই সুরে মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টিও ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল।

হুতোমপেঁচা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সাধু সাধু বলে বাহবা দিল। এতক্ষণে সোনাব্যাং চোখ খুলল। কোকিল এর অর্থ কিছুই খুঁজে পেল না। সে মনে মনে বলল, এখানে আর আমার থাকার কাজ নেই। যেই না সে উড়তে যাবে, হুতোমপেঁচা তার ডানা চেপে ধরল। মুচকি হেসে বলল, পালাচ্ছ নাকি ভায়া? কোকিল বলল, না ভাই চলি, আবার ফাগুনে দেখা হবে।

হুতোম বলল, যাবে যাও। তার আগে একটা কথা বুঝে নাও। কখনো কারও ভাষা বা কৃষ্টিকে ছোটো করে দেখো না। এই পৃথিবীতে বিধাতা সকল প্রাণীকেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়ে পাঠিয়েছে। তাকে ছোটো করে দেখা মানেই ভগবানের সৃষ্টিকে পরিহাস করা। কোকিল মাথা নীচু করে আসর থেকে বেরিয়ে গেল। সকলে হুতোমপেঁচার সমর্থনে হাততালি দিতে লাগল।

শিউলি আচার্য

বীর বনবাসী

সুরেন্দ্র সায়ে

জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সুরেন্দ্র সায়ে গোণ্ড জনজাতির মানুষ ছিলেন। তিনি ১৮০৯ সালের ২৩ জানুয়ারি ওড়িশার খিণ্ডা সম্বলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে সম্বলপুরের মহারাজার মৃত্যু হলে ইংরেজ শাসক সেই রাজ্য দখল করতে গেলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি বিপ্লবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে হাজারিবাগ জেলখানা দখল করে বন্দি বিপ্লবীদের মুক্ত করেন। জেল থেকে মুক্ত বিপ্লবীদের নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৮৬৪ সালে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত সুরেন্দ্রকে ইংরেজ পুলিস গ্রেপ্তার করে বন্দি করে। রাতেই তাঁকে রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন তাঁকে নাগপুর নিয়ে গিয়ে অসিরগড় জেলে বন্দি রাখে। অকথ্য অত্যাচারের ফলে তিনি ১৮৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জেলেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

জানো কি?

- একজন মানুষ ১৮ থেকে ৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত রক্তদান করতে পারে।
- বিছুটি লতার পাতায় ফরমিক অ্যাসিড থাকে।
- সাধারণ কম্পিউটার কিবোর্ডের সবচেয়ে লম্বা বোতাম হলো স্পেসবার।
- পৃথিবীর সবচাইতে মধুর ভাষা হলো বাংলা।
- গুলজারিলাল নন্দা দুবার মাত্র তোরোদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন (১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে)।
- ভারতের গোয়া রাজ্যটি স্বাধীনতার ১৪ বছর পর ১৯৬১ সালে স্বাধীন হয়।।

ভালো কথা

শাখা

আমি একজন স্বয়ংসেবক। এখনো এক বছর হয়নি স্বয়ংসেবক হওয়া। মাঠে খেলাধুলা দেখে আমার দাদিমা আমাকে শাখায় দিয়ে এসেছিলেন। প্রথমদিনই আমার খুব ভালো লেগেছে। সূর্য নমস্কার হয়। সঞ্চলন হয়। তারপর একেক দিন একেক রকম খেলা হয়। শেষে গোল হয়ে বসে গান, সুভাষিতম হয়। আর প্রতিদিন কোনো না গল্প হয়। গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। কোনো কারণে কোনোদিন শাখায় না আসতে পারলে শাখার দাদারা বাড়িতে এসে খোঁজখবর নেয়। কোনোদিন ঘুম না ভাঙলে শাখায় আসতে পারি না। সেদিন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

বিবেক রজক। সপ্তম শ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) প পী র ন	(১) প ং রা রী ধ্ব কা স ন্ন
(২) প শ্ব র র	(২) প প লা লো ন চ দ্ম শ

২১ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) আনুমানিক (২) ভারতবর্ষ

২১ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) অতিথিবৎসল (২) উত্তরপ্রদেশীয়

উত্তরদাতার নাম

(১) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪। (২) অরিত্র দাস, বোলপুর, বীরভূম। (৩) অমিত রায়, খালপাড়, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (৪) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

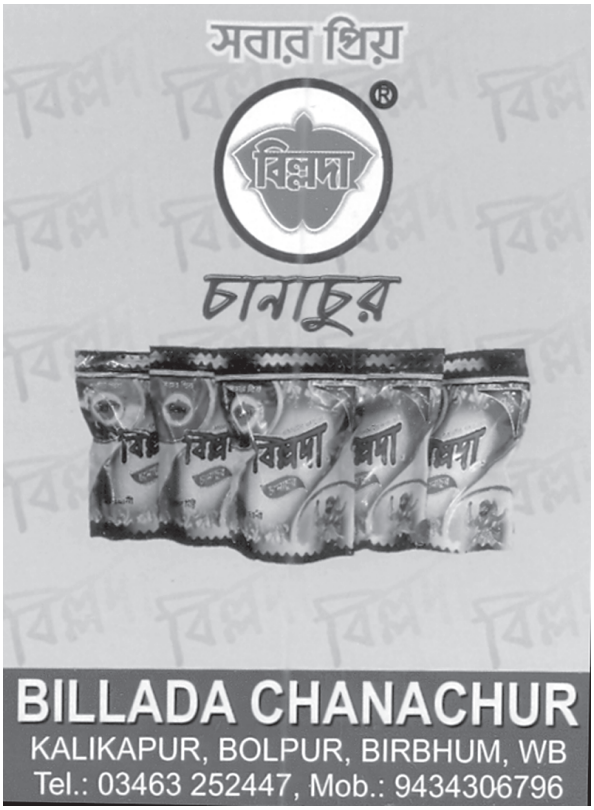

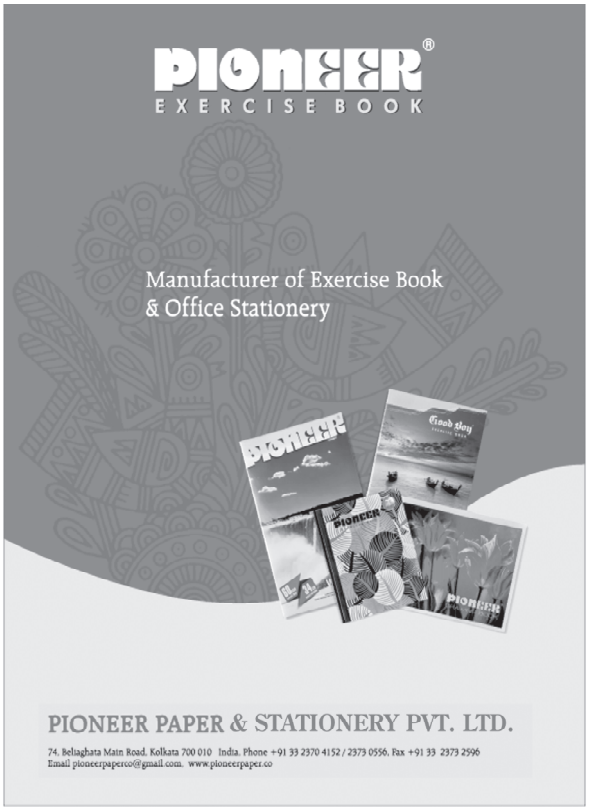

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কয়েক ডজন নারীর অবমাননা ও হত্যাকে ‘বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর উত্থান’ হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়েছিল

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

মণিপুর নিয়ে বিজেপিবিরোধী দলগুলো চলমান বিক্ষোভের মাঝে কিছু কথা মনে পড়ছে— বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের দুই রাজনৈতিক দল সিপিএম ও টিএমসি তাদের শাসনকালে নারীসম্মান কতটা রক্ষা করেছিল অথবা করছে তার কিছু শিহরণ-জাগানো উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হলো।

এক, ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ৫০ হাজার দর্শক-সমাগমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘অশোক কুমার নইট’ আয়োজিত হয়েছিল। ত্রুটিপূর্ণ লাউডস্পিকারের কারণে তা বাতিল হয়। কিছু দর্শক ক্ষিপ্ত হয়ে গোলমাল করলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। সেই সুযোগে মহিলা দর্শকদের শ্লীলতাহানি ও যৌন নির্যাতন করা হয়। পরদিন প্রচুর ছেঁড়া ব্রেসিয়ার ও শাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। অনেক নারীকে নগ্ন হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। অন্তত ৩০ জন নারী নিখোঁজ হয়েছিল। পরের দু’দিনে আশেপাশে কয়েক ডজন ধর্ষিতা বালিকা ও মহিলাকে খুঁজে বের করা হয় এবং অনেক ধর্ষিতা নগ্ন লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

কয়েক মাস পরে ফ্রন্টলাইন রিপোর্ট করে, ‘আমরা রবীন্দ্র সরোবরের ওপারে রয়েছি যেখানে ১৯৬৮-তে অশোক কুমার নাইট...সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল... মহিলারা নিজেদের বাঁচাতে... হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার থেকে এর কতটুকু তফাত?’ মধ্যযুগের জওহর ব্রত সেদিন দেখেছিল কলকাতা। বোঝা যাচ্ছে সত্য ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। জ্যোতি বসু-সহ সিপিএম নেতারা গণধর্ষণ এবং মহিলাদের হত্যাকে ‘বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর উত্থান’ বলে অভিহিত করে গণ-অপরাধকে ন্যায্যতা দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা সেই থেকে রাজনৈতিক নৈরাজ্য শুরু করে এবং তারা ১৯৭০ সালে ‘সাঁই বাড়ি হত্যাকাণ্ড’, ১৯৭৯ সালে ‘মরিঝাঁপি গণহত্যা’, ১৯৮২ সালে ‘বিজন সেতু গণহত্যা’ থেকে ’৯০-এ বানতলা গণধর্ষণ ও পরবর্তী খুন’ এবং ২০০৭-এ ‘নন্দীগ্রাম’ গণহত্যার নায়ক ছিল। তারা কর্মসংস্কৃতি ধ্বংস করে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রেণীহীন সমাজের নামে পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ করে দেয়। ৩৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গকে শ্মশানে পরিণত করেছিল।

দুই, ১৯৯০-এর ৩০ মে দুজন মহিলা স্বাস্থ্য অফিসার ও একজন ইউনিসেফ মহিলা প্রতিনিধি গোসাবায় টিকাদান সেরে কলকাতা ফিরছিলেন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। তাঁরা ইএম বাইপাসের কাছে বানতলায় পৌঁছলে ৪-৫ জন যুবক গাড়ি আটকায়। চালক পালাবার চেষ্টা করলে গাড়ি ওলটে যায়। ১০-১২ জন যুবকের আরেক দল এক মহিলাকে গাড়ি থেকে নামায়। অন্যরা অন্য দুই মহিলাকে বলাৎকার করতে শুরু করে। চালক প্রতিহত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হামলাকারীরা চালককে হত্যা করে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর তারা ওই অফিসারদের ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করে। এক মহিলা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে তাকে হত্যা করা হয়। রাত সাড়ে ১১টায় পুলিশ ওই অফিসারদের নগ্নদেহ ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালে আনে। দুজন জীবিত ছিলেন। তাঁদের ভর্তি

ফঃ ৬

কর হয়। মহিলা ডাক্তার মৃত মহিলাকে পরীক্ষা করে তাঁর গোপনাঙ্গের ভেতরে ধাতব টর্চ দেখে জ্ঞান হারান। ভোঁতা, ধারালো, ভারী অস্ত্রের আঘাতের ফলে চালকের শরীরে ৪৩টি ক্ষত হয়। তার পুরুষাঙ্গ থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। এসএসকেএম হাসপাতালে ৪ জুন ভোর ৫-৪০-এ তিনি মারা যান। পুলিশ জানায়, ছেলেধরা সন্দেহে উত্তেজিত জনতা মহিলাদের মেরেছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, 'এমন তো কতই হয়!'

ওই আধিকারিকরা গ্রামের শিশু ও অভিভাবকদের পরিচিত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে আসতেন। অকুস্থল থেকে যাত্রা শুরু করে গোসাবা পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। ওষুধ বিলোতেন। স্বাস্থ্যসমস্যার সুরাহা করতেন। কেউ তাদের ছেলেধরা বলে 'ভুল' করেনি। ইউনিসেফ বানতলাকে মডেল গ্রামে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু বানতলা পুরো বেল্টই ছিল সিপিএম দলের আশীর্বাদপুষ্ট অপরাধীদের আস্তানা। সেখান থেকে বিশেষত দক্ষিণ কলকাতা ভোট কেন্দ্রগুলোয় রিগিং করতে এখানকার গুন্ডাদের আনা হতো। সেখানে বড়োলোক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বাস। যাতে পার্টির বিরুদ্ধে তাঁরা না যান তাই এই দাওয়াই। ইউনিসেফ এলে দুষ্কৃতীদের আস্তানা উড়িয়ে দেবে পার্টি, এই ভয়ে গণহত্যা করিয়েছিল। পুলিশ পুরো জায়গাটা কর্ডন করে এবং মিথ্যা কেস ডায়েরি লিখে অপরাধীদেরই মদত জুগিয়েছিল।

তিন, ২০০৩-র ৫ ফেব্রুয়ারি ধানতলায় বরযাত্রীবাহী দুটো বাসকে ৫০ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী আক্রমণ করে। একটা বাস ধানতলার পূর্ব নপাড়া থেকে আয়েশমালি যাচ্ছিল। বাস থামিয়ে এক দুষ্কৃতী চালককে গুলি করে। তারা সোনা-রুপো, হাতঘড়ি, ব্যক্তিগত মালপত্র ছিনিয়ে নেয়। পুরুষদের বাসের ছাদে বসতে বলে মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করে। দ্বিতীয় বাসটা উলটো দিকে যাচ্ছিল। সেটাও থামিয়ে তার অসহায় যাত্রীদের অত্যাচার করে। চারঘণ্টা ধরে ডাকাতি ও ধর্ষণ চলে। সিআইডি তদন্তে প্রকাশ, দুজন ধর্ষিত ও সাতজন যৌনলাঞ্ছিত হয়েছিল। ১৯ মার্চ মূল অভিযুক্ত চিমু উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা থেকে গ্রেপ্তার হয়েও হেফাজত থেকে পালায়। ১ এপ্রিল মসলন্দপুর থেকে পুনরায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিআইডি কুর্বান আলিকে ২০০৪-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি ধরে। রানাঘাট সদর হাসপাতালে সার্জন চন্দন সেন কয়েকজন ধর্ষিতা-নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করেছিলেন বলে তাঁকেও খুন করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো চিমু সর্দার, কুর্বান আলি মণ্ডল, লোঢাই সর্দার, টুকু সর্দার। সাইদুল ইসলাম কারিগর প্রমাণাভাবে খালাস পায়।

চার, ২০১২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পার্কস্ট্রিটের এক নাইটক্লাবে এক মহিলার সঙ্গে প্রথমবারের মতো ৫ জন যুবকের (কাদের খান, মহম্মদ আলি, নাসির খান, রুমান খান এবং সুমিত বাজাজ) আলাপ হয়। তারা তাঁকে বাড়িতে লিফট দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। তারপরে চলন্ত গাড়িতে পাঁচজন তাঁকে ধর্ষণ করে এবং পরে এক্সাইড ক্রসিংয়ের কাছে ফেলে পালিয়ে যায়। প্রায় ৩.৩০টার দিকে একটি ট্যাক্সিতে চড়ে তিনি তাঁর বাসভবনে যান। মিডিয়া ও পুলিশ নির্যাতিতার নাম চেপে গিয়েছিল। প্রচলিত বিধি তাই, পরে তিনি প্রকাশ্যে আসেন যাতে অন্য নির্যাতিতারা মুখ খুলতে সাহস পায়; তিনি জানান তাঁর বয়স ৩৭ বছর এবং তিনি দুই সন্তানের মা।

তিনি বলেছিলেন, 'আমি কেন পরিচয় গোপন করব যখন আমার কোনো দোষ ছিল না? কেন আমি এমন কিছুর জন্য লজ্জিত হব যা আমি করিনি? আমি নৃশংসতার শিকার হয়েছি। মহম্মদ আলি ও কাদের খানকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, তারা পলাতক ছিল এবং নাসির খান, রুমান খান ও সুমিত বাজাজ হেফাজতে ছিল। টিএমসি দল ও মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতার উপর চরিত্রদোষ আরোপ করেছিলেন।

পাঁচ, ২০১৩ সালের ৭ জুন বারাসাত থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে কামদুনি গ্রামে ২০ বছর বয়সি ডিরোজিও কলেজের এক ছাত্রী বিকেলে কামদুনি বিডিয়ো অফিস রোড ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁকে অপহরণ করে একটি খালি কারখানার ভিতরে নিয়ে আটজন গুন্ডা ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর দুষ্কৃতীরা তার পা ধরে নাভি পর্যন্ত ছিঁড়ে, গলা কেটে তার লাশ পাশের মাঠে ফেলে দেয়। রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজারহাটের খড়িবাড়ির আট বিঘা অঞ্চলে একটি ভেড়ির পাশে নির্যাতিতার ভাইয়েরা তাদের বোনের লাশ দেখতে পান। রাত আনুমানিক ৯-৪৫ মিনিটে যখন পুলিশ লাশ উদ্ধারের চেষ্টা করে তখন গ্রামবাসী ও পুলিশের মধ্যে বসচা থেকে সংঘর্ষ ঘটে। জনতা পুলিশের তিনটে গাড়ি ভাঙচুর করে। প্রায় রাত দুটো নাগাদ পুলিশের এক বড়ো দল গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নির্যাতিতার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাতে পাঠায়।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে অভিযুক্তদের সাজা দেওয়া হয়। বিচারক গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আনসার আলি, সাইফুল আলি ও আনিমুল আলিকে মৃত্যুদণ্ড ও ইমানুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম ও ভোলা নস্করকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

এগুলি মণিপুরের ঘটনার কোনো পালটা যুক্তি নয়। মণিপুরের ঘটনা অনেক জটিল। তা কংগ্রেসের ভুল নীতির ফল। কায়েমি স্বার্থ গোষ্ঠীর মধ্যে আছে চীন ও বিদেশি খ্রিস্টানবর্গ। তাদের পরোক্ষ সমর্থনকারী কংগ্রেস-সিপিএম-টিএমসি, তাদের কোনো নৈতিক যোগ্যতাই নেই প্রধানমন্ত্রীকে নৈতিকতার উপদেশ দেওয়ার। □

ভারতবিরোধী বাম-কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক অন্তর্জাল রচনা

বাম-কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও দেশদ্রোহিতা জন সমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' এই দুই দেশবিরোধী ভারতীয় রাজনৈতিক দলের 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে।

স্বরূপ কুমার ধবল

আমেরিকার 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার একটা রিপোর্টে সারা ভারতে শোরগোল পড়ে যায়। পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশনে গত ৭ আগস্ট বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ওই রিপোর্ট অনুযায়ী হাড়হিম করা অভিযোগ আনেন কংগ্রেস আর কমিউনিস্টদের দেশ বিরোধী এক গোপন আঁতাতের। ২০২১ সালে 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর এই বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে।

কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী আর কমিউনিস্ট প্রকাশ কারাতের ভারতবিরোধী কার্যকলাপের পর্দা ফাঁস হয়ে যায় সমগ্র ভারতবাসীর কাছে। দেশের উন্নতি, সমৃদ্ধি বা কল্যাণের বিরুদ্ধে এই দুই শত্রুপক্ষের মহাজোট আণুবীক্ষণিক হলেও স্বদেশের ক্ষতি সাধন করে চলেছে। মোদী সরকারকে বিপাকে ফেলার প্রচেষ্টায় কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ভাই-ভাই।

মোদী সরকারকে সরানোর জন্যই তাদের আইএনডিআইএ জোট গঠন। দেশের মধ্যে বিরোধিতা সীমাবদ্ধ থাকলে তবুও মেনে নিতে অসুবিধা হতো না। বিশ্বের সবচেয়ে আগ্রাসী ও বিষাক্ত দেশ চীনের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়ে স্বদেশের ক্ষতিসাধনে তৎপর অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উত্তরসুরীরা।

অ্যান্টি ইন্ডিয়ান ইকোসিস্টেম মন্থন করতেই যে নামগুলো ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে দেশবাসীর কাছে অতি আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। তার পুরোভাগে রয়েছে ভারতের এক ডিজিটাল মিডিয়া 'News Click'। 'News Click'-কে অর্থের জোগান দিচ্ছে সুদূর আমেরিকাতে বসে বামপন্থী নেভিল রয় সিঙ্ঘম। ধনকুবের এই মিলিয়নিয়রের জন্য অর্থের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে আগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের প্রতিভূ কমিউনিস্ট চীন। বিষয়টি একটু খোলাখুলি আলোচনা করা যাক।

প্রথমে আসা যাক কে এই নেভিল রয় সিঙ্ঘম? জন্ম ১৯৫৪, ১৩ মে। স্থান আমেরিকা। বাবা পাঁড় কমিউনিস্ট। নাম আর্চিবাল সিঙ্ঘম। নিউ ইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ব্রুকলিন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। নিবেদিতা মেননের সঙ্গে এই পিতা-পুত্রের যোগাযোগের কোনো যোগসূত্র আছে কিনা এখনো জানা যায়নি, তবু কোনো যেন নামটি লেখনীতে চলে এল। কমিউনিস্ট শিক্ষাগুরুর পুত্র যে 'টুকরো গ্যাং'-এর একজন হবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। নেভিল Howard University থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পাশ করেন। ১৯৯১ সালে পিতার মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে চিকাগোতে সফটওয়্যার কনসালটেন্সি 'Thoughtworks'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ২০১৭ সাল পর্যন্ত তার চেয়ারম্যান।

২০১৬ সালে সিঙ্ঘম বিয়ে করেন জেডি ইভানসকে, A former Democratic political Advisor and the co-founder of code pink. ৬৯ বছর বয়সি এই নেভিলের বর্তমানে চীনের সাংহাই শহরে টাইমস স্কোয়ারের ১৮ তলায় একটি অফিস আছে। মূল কাজ চীনের প্রোপাগান্ডা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা। চীনকে বিশ্বসমক্ষে তুলে ধরা; ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, নাশকতা, বিশ্ব সমক্ষে ভারতকে ছোটো করা, অভ্যন্তরীণ গোলযোগে ফান্ডিং করা।

'News click' একটি ডিজিটাল মিডিয়া। ভারতে অবস্থিত। মালিক প্রবীর পুরকায়স্থ। মুখ্য সম্পাদক প্রাঞ্জল পাণ্ডে। রোহিণী সিংহ, স্বাতী চতুর্বেদী এই পোর্টালের দেশ-বিরোধী সাংবাদিক, যাদের নাম সদ্য সমাপ্ত সংসদ অধিবেশনে শোনা গেল। ২০২১ সালে 'News click'-এর অফিস, মালিক, মুখ্য সম্পাদক ও বেশ কিছু সাংবাদিকের বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ইডি দেশ-বিরোধী বহু তথ্য খুঁজে পেয়েছে। বিষয়টি কোর্টে এখন বিচারাধীন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ফান্ডিং করছে নেভিল রয় সিঙ্ঘমকে। সিঙ্ঘম ফান্ডিং করছে 'News click'-কে। The New York Times-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৮ কোটি টাকা ইতিমধ্যে ভারতবিরোধী কাজে এবং মোদী সরকারকে

বিপাকে ফেলার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে যার তথ্য ইডি প্রকাশ করেছে। আরও কতভাবে ফান্ডিং হয়েছে যার তথ্য পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতেও হয়তো পাওয়া যাবে না। নিশিকান্ত দুবে জানিয়েছেন, 'News click হচ্ছে Anti-Indian Gang এবং টুকরে টুকরে গ্যাঙের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।' কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, china, Congress and News click, a news portal, are part of one umbilical cord.' দুবে জানান, 'কংগ্রেস চীনাশক্তি এবং কিছু মিডিয়ার সাহায্যে ভারতকে ভেঙে ফেলতে চাইছে।' নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে In New Delhi, Corporate filings show, Mr. Singham's network financed a news site, News Click.'

এখন জেনে অবাক হবেন আপনার সামনে ভালো সেজে শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে, সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে এই বামপন্থীরা কীভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে আমাদের দেশের ক্ষতি করছে। প্রকাশ কারাত ও রাহুল গান্ধীর সহায়তায় নেভিল রয় সিঙ্ঘমের মধ্যস্থতায় ভারতের সবচেয়ে বড়ো শত্রুদেশ চীনের কমিউনিস্ট সরকারের হয়ে ভারতবিরোধী কাজ করে চলেছে। এই ইকোসিস্টেমের দেশবিরোধী বেশ কিছু কার্যকলাপ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার রাডারে ধরা পড়েছে।

১. ভারতের বিজ্ঞানীদের তৈরিকৃত কোভিড ভ্যাকসিন সম্বন্ধে অপপ্রচার করে দেশের মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার এবং বিশ্ববাজারে সন্দেহ সৃষ্টি করে চীনের ভ্যাকসিনের সুনাম প্রচার। বিশ্ব বাজারে ভারতীয় কোভিড ভ্যাকসিন যাতে কোনোভাবে বিক্রি না হয় তার আপ্রাণ চেষ্টা। এই চেষ্টা সফল হলে দেশের কয়েক হাজার কোটি টাকা লোকসান হতো।

২.অরুণাচল প্রদেশের বেশ কিছু স্থানকে চীনের ম্যাপের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বিশ্বব্যাপী সেই মানচিত্র প্রচার করছে বামপন্থী ও কংগ্রেসের মদতপুষ্ট এই নিউজ পোর্টাল। এতে অদূর ভবিষ্যতে চীন বিশ্বদরবারে এই ভূমি তাদের বলে দাবি জানাতে পারবে।

৩. ভারতের অভ্যন্তরে নকশালবাদী ও মাওবাদী আন্দোলন এবং সীমান্তে পাকিস্তান মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ বাড়ানোর জন্য নেভিল সিঙ্ঘমের মধ্যস্থতায় ফান্ডিং হচ্ছে।

৪. কৃষক আন্দোলন, শাহিনবাগ আন্দোলনে এত মানুষকে জমায়েত করেছিল কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। আর তাদের থাকা-খাওয়া, যাতায়াত ও পকেট খরচের জন্য ফান্ডিং করেছে চীন সিঙ্ঘমের মাধ্যমে।

৫. রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনের জন্য চীনা দূতাবাস থেকে ফান্ডিং করা হচ্ছে।

৬. চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কংগ্রেস মউ স্বাক্ষর করে ২০০৪ সালে। কী আছে এই প্যাক্টের নেপথ্যে?

৭. নেভিলের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল, ব্লগার, এনজিও, আমেরিকার 'থিঙ্কট্যাঙ্ক', দক্ষিণ আফ্রিকার একটি রাজনৈতিক দল, ব্রাজিলের কিছু মিডিয়া, ভারতের কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং News click-এর মতো কিছু দেশবিরোধী মিডিয়া।

৮. ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত গ্লোবাল মিডিয়াতে চীনের অর্থ লগ্নি ৫৫ হাজার কোটি টাকা। অন্যকে ছোটো করে চীনের প্রোপাগান্ডা তুলে ধরার জন্য এই বিশাল অঙ্কের অর্থের লগ্নি।

৯. কমিউনিস্ট নেতা প্রকাশ কারাত মোদী সরকারের সমস্ত কর্মেই বিরোধিতা করেন। তাঁর সঙ্গে বেজিং ও নেভিলের বারবার 'মেইল' বিনিময়ের পর্দা ফাঁস হয়ে গেছে।

১০. ভারত-চীন সীমান্তকে নিয়ে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের চীনের সঙ্গে এক গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার। ভারতের সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ ও বীরত্বের প্রশংসা ও সহানুভূতি না দেখিয়ে চীনের সৈন্যবাহিনী ও চীন সরকারের পক্ষ অবলম্বন করছে এই দুই ভারতবিরোধী দল। একটি 'মেইল' নমুনা হিসেবে দেওয়া হলো—

Subject : May have found the issue with new version of HD map with China

From : Neville Singham < jamcanroy@gmail.com>

'On the HD map we had changd (Taiwan and HK colors, CAPS reduction of Taipei to be a provincial capital not country capital). I think we missed the dotted line between India and china to the left (east of Bhutan).

Clearly China and India will have to have maps inside their Countries.'

জওহরলাল নেহেরুর আমলে কাশ্মীরের ৩৭,০০০ বর্গকিলোমিটার চীনের হস্তগত হয়। যা আজ আকসাই চীন ন্যামে পরিচিত। তিব্বত হাতছাড়া হয়। ১৯৬২ সালে অরুণাচল প্রদেশ চীনের হস্তগত হতে হতে বেঁচে যায়। রাহুল-সোনিয়া এখন দিল্লির গদি ফিরে পেতে চান, তার জন্য চীনের সহায়তা চাইছেন। বিনিময়ে অরুণাচল প্রদেশে চীনকে জমি আগ্রাসনের প্লাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছে। ভারতবর্ষ যেন তাঁদের বাপ-ঠাকুরদাদার কেনা জমি। মোদী সরকার থাকার ফলে চীনের জমি আগ্রাসন বন্ধ হয়ে গেছে। সীমান্তে সড়ক নির্মাণ এত দ্রুত গতিতে চলছে যার ফলে চীন ভারতীয় ভূমিতে দাবি জানতে পারছে না। সীমান্তে আর্মি ব্যারাক ঢেলে সাজানো হচ্ছে, নতুন নতুন বিমান ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে এবং পরিত্যক্ত পুরাতন বিমান ঘাঁটি সংস্কার করে আধুনিক প্রযুক্তিতে সেজে উঠছে। মহাকাশ গবেষণায় বিশ্বের নজর কেড়েছে। মনমোহন সিংহের ভারত বিদেশ থেকে কেবল যুদ্ধাস্ত্র কিনতে কিন্তু বর্তমান ভারত যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করে চীনের বাজার নষ্ট করে দিয়েছে। ডিজিটাল প্লাটফর্ম দেশবাসীর কাছে কত সুবিধাজনক তার ফল প্রাত্যহিক প্রতিটি কর্মে আমরা বুঝতে পারছি। করোনাকালে বিশ্বের বহু দেশের অর্থনীতিতে ধস নেমেছে অথচ সেসব দেশের জনসংখ্যা ৮-১০ কোটি। কিন্তু ১৪০ কোটির ভারতবর্ষের অর্থনীতি আজও অনেকখানি স্থিতিশীল। বিশ্ববাজারে অর্থনীতিতে ভারত এখন পঞ্চম স্থিতিশীল দেশ।

কংগ্রেস-বামপন্থীরা বিশ্বদরবারে অনর্গল মোদীকে বিপাকে ফেলার ও ছোটো করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যত বিরোধিতা করছে, মোদীর জনপ্রিয়তা বিশ্ব দরবারে ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি বিশ্বের এক নম্বর জনপ্রিয় নেতা। জো বাইডেন এখন স্বয়ং এগিয়ে এসে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য সারা বিশ্ব আজ মোদীর মুখাপেক্ষী। The Political Intelligence Company Morning Consult-এর রিপোর্ট অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। বিরোধীদের এটাই গাত্রদাহ। বাম-ভামেরা এখন নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করতে গিয়ে রাষ্ট্র বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি শত্রু দেশের সহযোগিতায় দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টি করে মোদী সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট করার জন্য বদ্ধপরিকর। ছোটো-বড়ো ২৬টি দল এখন আইএনডিআইএ গঠন করে ম্যাও ম্যাও ধ্বনি দিয়ে চীনের পদলেহনে দেশকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত।

বাম-কংগ্রেসের এই আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও দেশদ্রোহিতা জন সমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' এই দুই দেশবিরোধী ভারতীয় রাজনৈতিক দলের 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে। □

ফ্রান্সের স্কুলে আবায়া নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আট্টাল ফরাসি টেলিভিশন চ্যানেল টি এফ ওয়ানকে একটি সাক্ষাৎকারে জানান, কিছু মুসলিম মহিলা যে ঢিলে ঢালা, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পোশাক পরিধান করেন যা আবায়া নামে পরিচিত, সেই পোশাকটিকে ফ্রান্সের সরকার পরিচালিত স্কুলগুলিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় পরিচয় অনুযায়ী চিহ্নিতকরণ বন্ধ করতেই এই পদক্ষেপ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ফ্রান্সে উনিশ শতকের আইন অনুযায়ী জনশিক্ষা থেকে ক্যাথলিক পরম্পরাগত ধর্মীয় প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। সরকার পরিচালিত স্কুলগুলিতে ধর্মীয় চিহ্ন সংবলিত বস্তুসমূহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে আইনকানুনের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রসঙ্গত, বড়ো ক্রস, ইহুদিদের কিপ্পা, মুসলিমদের হেড স্কার্ফ পরিধান ফ্রান্সের সরকারি স্কুলগুলিতে অনুমোদিত নয়।

২০০৪ ও ২০১০ সালে জনস্থানে মুখঢাকা পোশাক নিষিদ্ধ ঘোষণার নির্দেশ জারির কারণে ৫০ লক্ষ মুসলিম জনসংখ্যা বিশিষ্ট ফ্রান্সে মুসলিম সমাজে জনবিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। ফরাসি স্কুলগুলিতে আবায়া পরিধানের অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়ে গত কয়েক মাস যাবৎ আলোচনা চলে যেখানে দক্ষিণপন্থী ও অতি দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আবায়ার মতো পরিধান নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনকারী এই বিষয়ে সম্মত হন। এর আগে স্কুলগুলিতে হিজাব বা হেড স্কার্ফ নিষিদ্ধ হলেও আবায়া তখন নিষিদ্ধ হয়নি।

পোশাকপরিচ্ছদ ধর্মীয় চিহ্ন বহনকারী নয় বলে ফ্রেঞ্চ কাউন্সিল অব মুসলিম ফেইথ নামে ফ্রান্সে বসবাসকারী মুসলমানদের একটি সংগঠন মতপ্রকাশ করেছে। তথাকথিত উদারপন্থী চিন্তাধারার বামপন্থীরা থেকে রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থী ফরাসি নেতৃত্বদের তরফে দলমত নির্বিশেষে ফরাসি সমাজে ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার স্বার্থে এই পদক্ষেপ বলে তথ্যভিজ্ঞ মহল মনে করছে।

লাদাখ প্রশাসনের ভিশন-২০৫০ প্রণয়ন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ লেহ ও কার্গিল জেলাগুলি নিয়ে গড়ে উঠেছে লাদাখ। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের গত চার বছরে দ্রুত বিকাশ হয়েছে। এখানকার তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানাম করে। কেন্দ্রীয় সরকার, সমস্ত স্তরে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় লাদাখের উন্নয়নে কাজ করছে। বর্তমান লাদাখ প্রশাসন 'ভিশন ২০৫০' প্রণয়ন করেছে, যা 'থ্রি-সি' ভাবনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে : সম্প্রদায় (নাগরিক- কেন্দ্রিক উন্নয়ন), সংযোগ (১০০ শতাংশ প্রাপ্যতা এবং গতিশীলতা) এবং ক্লাস্টার (বিকেন্দ্রীভূত আঞ্চলিক উন্নয়ন)।

এটি ৩৫ গিগাওয়াট সৌর এবং ৪ গিগাওয়াট বায়ু শক্তি উৎপন্ন করবে।

স্মার্ট এবং ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শেখার পরিবেশ তৈরি করা হবে, পাশাপাশি শিক্ষাদানকে একটি আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে উৎসাহিত করা হবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যাবে; প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে যাবে।

লাদাখে মোবাইল সংযোগ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হবে; হাসপাতাল, শিক্ষা ও পরিবহন পরিষেবা ডিজিটাল করা হবে।

সড়ক, সেতু, একটি ২২০ কেভি শ্রীনগর লেহ ট্রান্সমিশন লাইন এবং প্রায় ২৫০ কিলোমিটার 'হাই এবং লো ভোল্টেজ' ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন ছাড়াও, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৬০ হাজারেরও বেশি স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হচ্ছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ৬-১২ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়বস্তুতে পূর্ণ ১২,৩০০টিরও বেশি ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে জ্যোতির্বিদ্যা ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

একটি মেডিক্যাল কলেজ অনুমোদিত হয়েছে যা নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩২৫ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে এখানে সিন্ধু সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২০০০-এর বেশি সৌর আলো স্থাপন করা হয়েছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও নতুন শিল্প এস্টেট গড়ে তোলা হচ্ছে।

এক জেলা, এক পণ্যের অধীনে কার্গিলের সিবকাহার্ন এবং পশমিনা, লেহ'র এপ্রিকট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পশমিনা, এপ্রিকট এবং সিবকাহার্নের জন্য জিআইয়ের আবেদন করা হয়েছে, যাতে কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প এই পণ্যের সর্বাধিক মূল্য পায়।

লাদাখের দেশীয় পণ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁত, হস্তশিল্প এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে শিল্প উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য এনআইএফটি, এনআইডি, সিএসআইআর-আইএইচবিটি, কেভিআইসি, আইআইটি-এর মতো দেশের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

লাদাখ কেন্দ্রশাসিত প্রশাসন লাদাখে উদ্যোক্তা বিকাশে সহায়তা করার জন্য ইনকিউবেশন সেন্টারও স্থাপন করেছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হবে গ্রন্থটি।

এটি আগামী ৩ অক্টোবর '২৩ পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবতের করকমল দ্বারা বেলুড় মঠের প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা।

অনলাইনে টাকা পাঠালে নীচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

আবেদন

'শত সহস্র নারী এবং পুরুষ পবিত্রতার উদ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে, ঈশ্বরের প্রতি চিরন্তন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এবং সিংহের তেজে তেজবান হয়ে দরিদ্র পতিত এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য সহানুভূতি নিয়ে মাতৃভূমির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বরাবর ছড়িয়ে পড়বেন। প্রচার করবেন পরিত্রাণের বাণী, সাহায্যের বাণী, সামাজিক উন্নয়নের বাণী এবং সাম্যের বাণী।'

— *স্বামী বিবেকানন্দ*

এক আহ্বান

- বিবেকানন্দ কেন্দ্রে দুই বৎসর বা তার বেশি সময়ের জন্যে সেবাব্রতী হিসাবে যুক্ত হোন
- আপনি আপনার দেশবাসীকে ভালোবাসেন এবং তাদের জন্য কিছু করতে চান। সেই কারণে দুই বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য বিবেকানন্দ কেন্দ্রে সেবাব্রতী হিসেবে যুক্ত হতে পারেন।
- বিবেকানন্দ কেন্দ্র হলো এমন এক সংস্থা যার ভিত্তি হলো আধ্যাত্মিকতা। সারা দেশে এই কেন্দ্রের ৮৩০টি শাখা রয়েছে।
- এখানে একজন সেবাব্রতীকে তাঁর মৌলিক চাহিদা এবং কাজের জন্য একটি সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁর নিজেকে বহন করার জন্য কর্মদক্ষতা এবং যোগ্যতা থাকতে হবে।
- যদি স্বামীজীর বাণী আপনার মধ্যে দেশমাতৃকার জন্য কোনো ভাবনার সৃষ্টি করে এবং আপনি ভারতমাতার উন্নতির জন্য কিছু করতে চান, তবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার আহ্বান জানাই।

যোগাযোগ

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কলকাতা

৭৬/২, বিধান সরণি, ফ্ল্যাট এক্স-৩, দ্বিতীয় তল
(স্টার থিয়েটারের সন্নিকটে)
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
ফোন - ৯১ ৯৪২০০২৩১৭৫
ই-মেইল : kolkata@vkendra-org

Advt.

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের পরপর কয়েকটি দিনের কথা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার পথঘাট ভেসে গিয়েছিল নিরীহ হিন্দুদের রক্তে। সেই সময় হিন্দুদের পরিত্রাতা রূপে যিনি পথে নেমেছিলেন, তাঁর নাম গোপাল মুখার্জি। পারিবারিক সূত্রে পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল বলে লোকে তাঁর পদবির জায়গায় 'পাঠা' বলত। সেই অদম্য সাহসী হিন্দু রক্ষাকারী মানুষটির জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন **নারায়ণ চক্রবর্তী** তাঁর লেখায়— **ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক।**

বর্তমান ভারতে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি বহুচর্চিত। সেই সূত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রসঙ্গটিও। আর এই 'হিন্দুত্ব' শব্দটি গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে সর্বপ্রথম যিনি বিদ্বজ্জন সমাজে তুলে ধরেন সেই চন্দ্রনাথ বসুর জীবন ও সমাজ ভাবনা নিয়ে লেখা--- **'হিন্দুত্ব : চন্দ্রনাথ বসু ও আর এস এস'। লিখেছেন— বিজয় আঢ্য।**

সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই শুভ-অশুভ , দেব অসুরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নানান রূপে আজও প্রবহমান। মাতৃপূজার এই শুভ লগ্নে অসুরদলনী দেবী দুর্গার সেই অতুলনীয় বৈচিত্র্যময় এক রূপের কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন **প্রবাল** তাঁর লেখা— **'অথ ত্রিলিঙ্গ কথা...'** য়।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে গান্ধীহত্যার ঘটনায় যুক্ত করার চক্রান্তের দিক উন্মোচন করেছেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক **সুজিত রায়** তাঁর রচনা— **নাথুরামের বিচার ঃ এক অন্তহীন কোর্টরুম ড্রামা'য়।**

আরও যাঁরা লিখেছেন—

দেবী প্রসঙ্গ

ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

পুরাণ কথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প

সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দেবদাস কুণ্ডু, সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জোশী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী , ড. পঙ্কজ কুমার রায়

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা